

ইন্দ্ৰ ।



উপন্যাস ।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার

প্রণীত ।



কলিকাতা

১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট

মজুমদার লাইব্রেরি হইতে শ্রী অক্ষয়নাথ বসু রায়

কর্তৃক প্রকাশিত ।

কলিকাতা

২৪ নিউজাস লেন, স্বদেশ প্রেসে
শ্রীদেবেশ নাথ বিশ্বাস দ্বারা
মুদ্রিত ।

উৎসর্গ পত্র ।

বাঁহার যত্নে ও আশ্রয়ে বাল্যকাল
 বাঙলা সাহিত্যে আমার অনুরাগ জন্মে,
 বাঁহার উৎসাহে ও আদর্শে আমি
 শোরে বাঙলারচনায় ত্রুতী হই
 অপার স্নেহে, সংসারের নিদারুণ ব্যাধিতে ও
 এ জীবন স্নিগ্ধ, আমার সেই—

পূজনীয় অগজ

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম ।

কলিকাতা

১লা শ্রাবণ

১৩০২

} শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার ।

একটি কথা

কয়েক বৎসর অতীত হইল ইহা প্ৰকাশ
করেকটি পরিচ্ছন্ন কিংবা পরিবর্তিত ভাবে ছোট
পত্রে আকারে "সাহিত্যে" দিরাছিলাম। শেষে
তির মামে এই গ্রন্থ "উৎসাহে" সমাপ্ত হয়। যাঁহা
মির্জা এই ক্ষুদ্র উপগ্রাস সম্পূর্ণ করিরাছিলাম,
উৎসাহের প্রবর্তক ও সম্পাদক অকপট সাহিত্যা-
লুপ্তি উদারহৃদয় আমার একান্ত স্নেহাস্পদ সেই
প্রিয়দর্শন সুরেশচন্দ্র আর ইহলোকে নাই। জীব-
নের মধ্য-পর্বে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, জীবনের
পবিত্র-ব্রত সমাপ্ত করিতে না করিতে, তিনি আত্মীয়-
স্বজন বহুবান্ধবের কাছাইরা লোকান্তরে প্রয়াণ
করিরাছেন। আজ এই উপগ্রাসখানি গ্রন্থাকারে
প্রকাশ করিবার দিনে তাঁহা হই কণা ষারবার মনে
পড়িতেছে। তাঁহার সেরূপ আগ্রহ তির হয় ও
"ইন্স" উপগ্রাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইত না।
আমার এ সমস্ত হৃদয় সঞ্চিত এই অবকাশে কৃত-
জ্ঞতা স্বীকার করিতেছে।

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ ।

১। চিত্র-বিচিত্র—(১৫টি নক্সা ও ছোট গল্প
একত্রে) ভাল কলি ও কাগজে ছাপা, উত্তম
বঁধাই। ১।০

২। শোভা (উপহাস) শিশু প্রকাশিত
হইবে।

২০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বঙ্গলদার মহিবেদীতে
প্রাপ্য।

ইন্ডু



প্রথম পরিচ্ছেদ ।



“কিলো তোরা ঘাটে যাবি নে? তোদের যে আর
বারই হয় না?”

২য়। কি আর করি বোন্, এই তোদ সইয়ের
জন্তই যত দেরি!

১ম। সইয়ের জন্ত দেরি কেন?

২য়। ওঁর আর আজ চুল বাঁধা মনস্তর হচ্ছে
না!

১ম। কেন লো সই?

৩য়। দূর,—তুইও যেমন, বোয়ের কথা শুনিদ্
কেন? বউ, তুমি কিন্ত ভাই ভাণি মিচ্‌কতানি!

বো মুহ্‌ মুহ্‌ হাসিলেন, হালিয়া বলিলেন “তা
সতি কথাই ত বল্‌চি ঠাকুরকি, তোর যে ভাই

পেটে বিদে মুখে লাজ ! তা সইকে আর অন্ত
লজ্জা কেন ?

১ম। কি লা নই ?

৩য়। বোয়ের মাথা !

২য়। আমার মাথাই হোক আর মুণ্ডই হোক,
কথাটা কেন সইকে খুলেই বল না ? ওলো, আজ
রাত্রে আমার এই ঠাকুরকি-ঠাকুরাণীর পূজা হবে,
তাই আমি প্রতিমাথানিকে যত্ন কোরে সাজাচ্ছি !

সম্বন্ধে নন্দ ভাক্ত, তবু ছুজনে বড় ভাব।
ঠাকুরকির সই বলিয়া, কুসুমের সঙ্গে ও বোয়ের বেশ
প্রণয় ; তিনজনেই সমবয়স্কা, তিনজনেই যুবতী !

কুসুম। পূজো কি লা ? নে ভাই ও সব
হেঁয়ালি মেয়ালি রাষ্ট্ ! কথাটা কি সত্যি বল না ?

বৌ। আ আমার কপাল, এটাও বুঝলি নে—
আজ যে ঠাকুরজামাই আগবেন !

কুসুম। মাইরি ? ই্যা লা সই, কই, তুইও ত
ও বেলা আমাকে কিছু বলি নে ? খতি ঘেরে
বা' হোক কিছ ; আমার সঙ্গেও মুকোচুরী !

সই, সইয়ের কথার উত্তর দিতে না দিতে, বৌ

বলিয়া উঠিল, “তা ভাই, বলে নি কি সাথে? কত দিনের পর আজ ঠাকুরজামাই আসছেন, পাছে আবার তোরা এসে রাজে সনয় নষ্ট করিস্! তা, আজ আর তোদিকে ভাগ দেবে না, কাল হাতে যা হয় করিস্।” ঠাকুরঝি একটু হাসিয়া বোকে চিম্টি কাটিয়া বলিল—“মরণ আর কি?”

বো। ম'ণে বুঝি নিকটক হোস্।

কুসুম। নে এখন রঙ্গ রাখ্। প্রভাতবাবু কখন আসবে, বল্ না ভাই? এ খবরটা কি এতক্ষণ আমাকে দিতে নেই?

এই বলিয়া কুসুম সহৈয়ের দিকে চাহিল। মধুর অধরখানি অভিমানে একটু ফুলিয়া উঠিল!

সই ইন্দু এতক্ষণ বোয়ের সঙ্গে সহৈয়ের রঙ্গ দেখিতেছিলেন, আর টিপিটিপি হাসিতেছিলেন, সহৈয়ের অভিমান বুঝিয়া, এতক্ষণে তাঁর আসন টলিল। ব্যাপারখানা সহিকে জানাইবার জন্ত ইন্দুর হৃদয়টুকু আকুল হইয়া উঠিতেছিল, বোঠাকুরাণী মুহূর্ত্তে এই বিপদ হইতে ইন্দুকে মুক্ত করিলেন। বো, আসলে বিস্ত লোকটি মন্দ নন!

বো। তা কুহ্নন, তুই ভাই রূগ করিন্ নে।
 প্রভাতবাবু আজ রাত আটটার গাড়িতে আসবেন।
 তোকে বলবে কি, আমবাই একটু আগে খবর
 পেলাম। তবে ভাই, তোমার সহৈয়ের মনের
 খবর রাখিনে, যদি তিনি মনে মনে আগে জেনে
 থাকেন,—তা' এখন তোমাদের সহৈয়ে সহৈরে বুঝা-
 গাড়া।

কুহ্নন আবার সহৈয়ের দিকে চাহিল, এ চাহনি,
 হাসি-আহ্লাদে ভরা-ভরা। চারি চক্ষে মিলিল!
 চোখে চোখে কি কথা হইল জানি না, কিন্তু উভয়ে
 উভয়ের মনোভাব বুঝিলেন। সহস্র কথায় যাহা
 প্রকাশ না পায়, সময়ে, একটু হাসি, একটু অপা-
 ক্ষের দৃষ্টি, তাহা বুঝাইয়া দেয়। চুল-বাধা শেষ
 হইল! এবার পরপারে সিন্দূর দেওয়ার পালা।
 সিন্দূর পরান শেষ হইলে, তিনজনে, গামছা কাঁধে
 কাপড় কাচিতে বাহির হইলেন।

পথের আশেপাশে ছোট ছোট আম-কাঁঠালের
 বাগান। মাঝে মাঝে দুই চারিটা বাঁশঝাড়। জোঁট-
 বাস, বেলা অপরাহ্ন। পাখীর দল গাছে বসিয়া,

কাকলি করিতেছে। দূরে কোকিল পাণ্ডিয়ার
উচ্ছ্বাস পরদায় পরদায় উঠিতেছে। ঘাটে ঘাইতে
ঘাইতে এই কোকিল-পাণ্ডিয়ার ডাক উপলক্ষ্য
কবিতা, বৌ ও কুসুম মাঝে মাঝে ইন্দুকে
লইয়া নানা রঙ্গ করিতেছিলেন। পথে তাঁহাদের
সঙ্গে বানা, রামা, শ্যামা অনেকেরই দেখা হইল।
মঝলেই এক তীর্থের যাত্রী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।



প্রসন্নপুর ক্ষুদ্র গ্রাম । গ্রামের প্রান্তরে ‘তাল-
পুকুর’ নামে একটি পুকুরিণীর ঘাট বোধান । ঘাটের
উপর দুই পাশে দুইটি অশ্বখ ও বটের গাছ ।
অনেক তালপুকুরের কথা শুনা যায়, কিন্তু সে
সব পুকুরিণীর চারি ধারে তালগাছের নামগন্ধও
নাই । শালুয যায়, নাম থাকে, সুখ যায়, স্মৃতি
থাকে, এই সব পুকুরিণী বুঝি তাহারই উদাহরণ-
স্তল । কিন্তু আমাদের এই পুকুরিণীর নামের মূলে,
কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত ছিল না । ইহার
চারি ধারে বড় বড় তালগাছের সারি, পুকুরিণীটি
বৃহৎ, জল বড় পরিষ্কার ।

অপরাত্নে কয়েকটি রমণী গা ধুইতে ঘাটে নামি-
লেন । জল যেন শিহরিয়া উঠিল ! পুকুরিণীতে
পদ্মবন নাই, কিন্তু জলাশয়ের সৌভাগ্যগুণে, দুটি
বেলায় অনেকগুলি কমল ইহার বক্ষে ফুটিয়া উঠে !

সন্তঃপ্রসূতি এই পদ্মিনীকুলের বর্ণনা কইরা আমার একটু গোলে পড়িতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে কাহারও বয়স পনেরো কংসরের অধিক নহে। তবে ইহাদের যুবতী, কি কিশোরী, কি বলিষ? কবিগণ ষোড়শকেই যুবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কালের স্রোতে সে দিনকাল ভাসিয়া গিয়াছে। বঙ্গললনার যৌবনের নিতান্তই ‘অকালবোধন’। এখন যুবতীর বর্ণনা করিতে গেলে, দাদনী বলিয়াই কহিতে হয়। তার পর যেন অনাবস্তার দিকে চলিয়া পড়ে।

আজ অনেক দিনের পর, ইন্দুবালায় স্বামী আসিতেছেন, তাই তার সমবয়সীমহলে একটা ভলম্বল বাধিয়াছে। তামাসার সময় ইন্দু কাহাকেও ছাড়ে না, তাই আজ ইন্দুকে কেন্দ্রীভূত করিয়া এই যুবতীর দল, হাসি তামাসা-রঙ্গরঙ্গে পুঙ্খবিন্ধ্যের আসর গুলজার করিয়া তুলিয়াছেন। ইন্দু যে ইহাতে আনন্দ অমূল্য না করিতেছে, তা নয়; তবে সে সহসা ধরা দিতে রাজি নহে! কিন্তু মনের এ উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখা সরলা বালিকার

কাজ নয়। তার প্রতি কথায়, প্রতি হাসিতে সে আনন্দহিল্লোল খেলিতেছিল।

ইন্দুর অমারিকতায় সবাই তাকে বড় ভাল-বাসে। আজ তামাসার বেলায় কিন্তু কেহই তাকে ছাড়িতেছে না। সই যে সই, সে-ও আজ থাকিয়া থাকিয়া চোরা বাণ মারিতেছে। ইন্দু মাঝে মাঝে সইকে ভ্রমণ করিতেছিল, আর কুন্দদণ্ডে বিদ্যধরখানি টিপিয়া ক্ষুদ্রহস্তে ক্ষুদ্র কিল দেখাইতেছিল। কিন্তু সই ত আর পুরুষমানুষ নয়! এ সব সে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিল!

এইরূপে সুন্দরিগণের কাপড়কাচা শেষ হইল। তখন বাঁহাদের জল লইবার প্রয়োজন, তাহারা কলসী লইয়া জল পূরিতে লাগিলেন। পুরিবার সময় চারিধার হইতে ছুটিয়া ছুটিয়া নাচিয়া নাচিয়া জল আসিতে লাগিল। তাঁর পর পূর্ণকলসীকণ্ঠে যুবতীর দল, যখন ধীরে ধীরে গজেন্দ্রগমনে চলিতে আরম্ভ করিলেন, কলসীর জল তখন আনন্দে তালে তালে নাচিতে লাগিল। জল কি সৌন্দর্য্য ভালবাসে? অনিরাছি, শতযোজন দূরে,

চক্ষু দেখিয়া সমুদ্র উথলিয়া উঠে, ইহার সত্যাসত্য প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু রমণীর মুখচন্দ্র দেখিয়া কক্ষস্থ কলসীর জল যে উছলিয়া উঠে, তাহা নিতান্ত কবি-কল্পনা নহে।

সহসা এই যুবতীদলের গতিরোধ হইল। বিপরীত দিক্ হইতে আর একদল রমণী, তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। ইহাদের অধিকাংশই যৌবনের শেষদীপ্তির পা দিয়াছেন। উভয়দলে দুই-চারিটা কথার পর বয়স্কার দল অগ্রসর হইলেন। কিন্তু “ডাক্তারগিন্নি” তখনও নবীনাদলের সহিত কথা কহিতে রত! ডাক্তারগিন্নি—ডাক্তার হরকালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের—দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী। সমবয়সীগণে তিনি ডাক্তারনী’ বলিয়া পরিচিতা। ডাক্তারগিন্নির বিলম্ব দেখিয়া, তাঁর দলের একজন তাঁকে ডাকিয়া বলিলেন, “বলি, ও ডাক্তারনী, তুই যে দেখি, সিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশ্‌লি!” ডাক্তারগিন্নি তখন নাতনীদের সঙ্গে রঙ্গরঙ্গে মগ্না, হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, “সিং ভাঙতে হবে কেন লো, আমি যে নেড়ি, তা তোরা না হয় একটু

আগে বা, আমি যাচ্ছি।” এইখানে ডাক্তারগিরির আর একটু পরিচয় দিয়া রাখি। তিনি নিঃ-
সন্তান, কিন্তু সেজন্য তাঁর কোন অশান্তি নাই।
সেই স্বামিসোহাগিনী,—সদাই হাস্তময়ী, সদাই
প্রফুল্ল! লেখা পড়াও তাঁর মোটামুট জানা আছে।
রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, চণ্ডীদাস প্রভৃতি
তাঁর একরূপ কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়। নবীনাদলের
অধিকাংশই তাঁর নাতনী বা নাতবৌ। ঠাকুরাণী
দিদি কিন্তু কেবল এই সবকেই সম্বলী নন, নাতনী
বা নাতবৌদের সঙ্গে তিনি কত রকমের কত
নূতন নূতন সম্বন্ধ পাতাইতেন। ইন্দু তাঁর “সাধের
বাগান”, আর ইন্দুর সহী কুসুম হচ্চেন তাঁর
“আতরদানি”, তা ছাড়া কেহ “দেখনহাসি”,
কেহ “মাইডিম্বার”, কেহ “লেবেন্ডার”, কেহ
“ওডিকলম”, কেহ বা “চৌথের বালি”। নাতীর
দলে বিশেষত নাতজমাই মহলেও তাঁর পসার কম
নয়! ডাক্তারগিরি ইন্দুকে সম্বোধন করিয়া কহি-
লেন, “কি লো সাধের বাগান, আজ নাকি মালী
আগে? আমি ত ভাই ভাবছিলাম—‘ফুটিয়ে

কলি, পড়ছে ঢলি, কই ত অলি এলো না !' তা
এতদিনে বুঝি মনে পড়েছে। কাল গিয়ে তার
মালিগিরি ঘুচিয়ে দিয়ে আস্বে।" ইন্দু নতমুখে
একটু হাসিল, সেই কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে
ঠাকুরাণীদিদির কথার ছল ধরিল, "সইয়ের মালি-
গিরি ঘুচিয়ে দিয়ে নিজের মালী ক'রে নেবে
ঝি আতরদানি ? তা হলে যে ডাক্তার-ঠাকুর-
দাদাতে আর প্রভাতে চুলোঢ়ালি বেধে যাবে গো ?"
ডাক্তারগিরিও বড় সোজা নন, বলিলেন, "দূর নেকি,
তোর ঠাকুরদাদার তা তা'হলে ভালই হবে।
পুরাণ বাগান গিয়ে তার আবার নূতন বাগান হবে,
সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত কুসুমকলিটিও পাবে।"

কুসুম ! না গো না, আতরদানি ! সাজান
বাগান ছেড়ে দিয়ে কেউ কি আর নূতন বাগান
চায় ?

ডাক্তারগিরি। আ মর্ ! ঐ দেখ্,—রোগী
মেরে, ঘোড়ায় চড়ে', আসচে আমার বর !

বাস্তবিক, দূরে ডাক্তারবাবু ঘোড়া ছুটাইয়া
আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নবীনার দল

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ডাক্তার-ঠাকুরদাদার সাম্নে পড়লেই ত সৰ্ব্বনাশ! এখন, কি না কি বলে বসবে! ঠাকুরাণীদিদিটিও হাসিতে হাসিতে মরালগতিতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে একবার একটু ফিরিয়া বলিলেন,—“কাল ছপুর-বেলায় যাব লো বাগান। তোর তো ভাই, এখন পাথরে পাঁচ কিল!”

এইরূপে আনন্দে আনন্দে কাটাইয়া সকলে আপন আপন গৃহে ফিরিলেন। পল্লিগ্রামের রমণীগণ, বিশেষত নুবতীব দল, এই উপলক্ষ্যে দিনান্তে এক-বার একত্রিত হইত। এ সময় তাঁহাদের বড় স্মৃথে কাটে। প্রণয়ী-যেমন প্রণয়িনীর মিলনের আশাপথ চাহিয়া থাকেন, সে প্রবাসী বাঙালী, যেমন, শারদীয়া পূজার ছুটির আশঙ্ক করেন, বালিকাবধূ, যেমন, পিত্রালায়ে যাত্রার দিন গণিতে থাকেন, ইঁহারাও বুঝি সেইরূপ আশঙ্কিত, একাগ্রমনে এই সময়টুকুর প্রতীক্ষা করেন।

ক্রমে সন্ধ্যা বসন্ত হইল, গৃহে গৃহে দীপ জলিল, ইন্দুও পল্লিগ্রামের দীপও জলিয়া উঠিল।

সারাটি বৎসর ধরিয়া, ঈন্দু স্বামীর আশাপথ চাহিয়া
আছে। ইহার পূর্বে সে স্বামীর সহিত ভাল
করিয়া কথা কহিতে পারিত না, আজ কি
পারিবে ?



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



ঠিন্ ঠিন্ ঠিন্ শব্দ সহসা ইন্দ্র যুম ভাঙিয়া
গেল। কিন্তু যুমের ঘোরে সে শব্দটা বে কিসের,
তা' বড় 'ঠাণ্ডা' করিয়া উঠিতে পারিল না।
ভাড়াভাড়ি স্বামীর পাখিল বাজুপাশ হইতে আপ-
নাকে মুক্ত করিয়া উঠিয়া বসিল। অসংযত বেশ,
আলুখালু কেশ, একটু সংযত করিয়া লইল। তখন
নিদ্রালস চক্ষু মুছিতে মুছিতে, মুক্ত বাতায়নপথে
দেখিল, সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। তবু রক্ষে!
সে ত ভেবেছিল, না জানি কত বেলাই বা হইছে।
সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরানীদিদিদের বিক্রমের দাক্ষণ বিস্তীৰ্ণ-
কাণ্ড বুঝি তার মনে আগিয়া উঠিয়াছিল।

আর বুঝি মনে হইতেছিল—

“রজনী না যেতে, আগালে না কেন,

বেলা হ'ল মরি লাজে।

সরমে অড়িত, চরণে কেননে,

চলিব পথের মাঝে॥”

ঘর হইতে সাইবার পূর্বে, এই সুযোগে, নিদ্রিত স্বামীকে এতবার তাল করিয়া দেখিবার লোভটুকু ইন্দু সাধারণ করিতে পারিল না। রাত্রিতে লজ্জার সে ভাল করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই। এখন স্বামীর অজ্ঞাতে ইন্দু, অনিমেষে সে মূর্তি দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে দেখিল, কপালে তাঁর বিন্দুবিন্দু স্বেদ ঝরিতেছে। ইন্দুর বড় সাধ হইল, ঘাম মুছাইয়া একটু বাতাস করে, কিঙ্ক কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল—“কি জানি যদি ঘুম ভেঙে যায়, তবে ত ধরা পড়্ব, ছি!”—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বেন কতকটা আপনার অজ্ঞাতেই ইন্দু, ধীরে ধীরে, স্বামীর কপাল মুছাইতে লাগিল। বা হাতে, পাখাখানিও তুলিয়া লইল। কোমল অঙ্গুলীর কোমল স্পর্শে প্রভাতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি চারি চক্রে মিলিল। ইন্দুর হাত হইতে পাখা পড়িয়া গেল। সে তখন লজ্জার জড়সড় হইয়া মুখখানি নীচু করিল। প্রভাত সেই ব্রীড়ানন্ত মুখখানি দেখিবার জন্য ইন্দুর চিবুক ধরিলেন,— তিক সেই মুহূর্ত্তে, কে বেন আবার ঠিন্ ঠিন্ ঠিন্ শব্দে

বাহিরে শিকল নাড়িল। ইন্দু লজ্জানত নয়নপল্লব-
চুটি স্বামীর পানে একটু তুলিয়া বলিল—“এখন
ভবে বাই।”

কপাট খুলিয়া ইন্দু দেখিল, সে যা ভাবিয়াছে,
ঠিক তাই বটে। সম্মুখে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া
সই! পোড়ারমুখী সই নইলে, বাত পোয়াতে না।
পোয়াতে এত মাথাবাথা আর কার? ইন্দু
বাহিরে আসিলে সই একমুখ হাসিয়া বলিল, “কি
নো!” তখন দুই সইয়ে হাতবরাবরি করিয়া
নিরুত্তরে চলিল।

দেখিতে দেখিতে বৌ এবং আর আর সম-
বয়সীরা আসিয়া জুটিতে লাগিল, ক্রমে—

“শ্রামলা বিমলা, মঙ্গলা সরলা,

আইলা ইন্দুর পাশে।

বদি যতন্তরে, তথাপি ইন্দুরে,

পর্যগ অবিক বাসে ॥

ইন্দুমুখ দেখি, হৈয়া মহাত্মী,

কহয়ে কৌতুক কথা।

রজনী-বিলাস শুনিতে উল্লাস,
অমিয়-অধিক গাথা ॥

হাস পরিচাসে, রসের আবেশে,
নগন হইল ইন্দু ।

সে নিশি কাঁচনী, রস-নির্কারিণী,
কবি মাগে এক বিন্দু ॥”

চতুর্থ পিচের দ।



দিবাবৈঠকে সবাক্কে প্রভাতের অস্তঃপূরে ডাক
পড়িল। প্রভাত ঘরে গিয়া দেখেন, কুসুমপ্রমুখা
সখীর দগ, ইন্দুকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। প্রভাত
গৃহে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কৈ, কেহ ত কিছু
বলে না! সকলেই অতৃদিকে চাহিয়া আছে।
যেন তাঁহাকে কেহ দেখে নাই! প্রভাত কিছু
গোলে পড়িলেন, বুঝি একটু অপ্রতিভ হইলেন।
এই সময়, ইন্দু একবার, সখীদের লুকাইয়া, স্বামীর
পানে চাহিল, তাহার মখুর আরে একটু মধুর
হাসি খেলিল! প্রভাত বাপার বুঝিলেন, বলি-
লেন—“আসামী হাজির।” কিন্তু তবু কোন উত্তর
নাই, কেবল ইন্দু, আর একবার তেমনই হানিয়া
চাহিল,—প্রভাত পুনঃ বলিলেন,—

“তলব হ'য়েছে কেন রাইয়ের দরবারে?”

এবার কুসুমের মুখ ফুটিল,—“তুমি গরহাজির,
তাই রাইরাজার কাছে, মান বাদী হ'য়েছে।”

প্রভাত ! তলবনা ত হাজির হয়েছি।

কুসুম। তলব করতে হয় কেন ? তা' অতশত বুঝিনে, এখন মান ভাঙ।

প্রভাত। কেমন ক রে ভাঙতে হবে ?

কুসুম। “তা আমি কেনন ক'রে বসব ? আমি কি পুণ্যমাতৃষ ? এ ত তোনা দরই কাজ, ঐ দেখ”—বীয়া দেওয়ানের একখানি ছবি দেখাইয়া দিল—প্রভাত দেখিলেন—মানভঞ্জনর ছবি—তার নীচে ছাপার অক্ষরে লেখা—“দেহি পদপদ্মবমুদারম্।” প্রভাত একটু হাসিয়া বলিলেন,—

“তোমরা সব সখী মিলে

তাল ফলালে তিলগাছে,

মানের সাগর প্রবল এখন

আমি কেমনে ফেলি ছেঁচে !”

সকলে হাসিয়া উঠিল। কুসুম হাসি থামাইয়া বলিল, “কেন, তোমার কি কোন দোষ হয়নি নাকি ? এতদিন ভুলেছিলেন, সেটা বুঝি অপরোধ নয় ! সেই বেই ভালবাসুয, তাই অজে ছেড়েছে !”

প্রভাত। আর তুমি হ'লে ?

কুসুম একটু অপ্রতিভ হইয়া ক্রকুটী করিয়া—
“আহা কি কথাই বলেন আর কি?” বলিয়া
সইয়ের দিকে চাহিল। বলিল, “মিসের আক্কেল-
খানা দেখ একবার।” সই একটু হাসিল।

তার পর সে গুণগারার দ্বন্দ্ব মিটিয়া গেল। ইন্দুর
অহুরোধে কুসুম কপাট বন্ধ করিয়া আসিল—
পাছে কর্তানা, কি আর কেউ, ঘরে আসে।
তা হ'লে ত বড় অপ্রতিভ হ'তে হবে!

এতক্ষণ কুসুম একলা আসর রাখিয়াছিল,
দোর বন্ধ করিবার পর, বো-ঝি সবাই এখন নিশ্চিন্ত
হইয়া কুসুমের সহকারিগাক্ষেপে বাক্যে বোণ
দিল। মহারথী হইলেও সপ্তরথী-বেষ্টিত অভি-
মুখ্য মত-প্রভাতকে এ যুদ্ধে কিছু বিব্রত হইতে
হইল!

ধম্, ধম্, ধম্, কে দরজার ধাক্কা দিল। ধাক্কা,
ধাক্কা, ধাক্কার পর ধাক্কা, সে ধাক্কা আর থামে না—
ইন্দু জিভ্ কাটিয়া, একহাত ঘোমটা টানিয়া, এক
কোণে লুকাইল, বোর দলও, যেন কিছু শব্দান্ত
হইয়া উঠিল। কুসুম তাড়াতাড়ি দরজার নিকট

আসিয়া হাঁকিল—“কে গা?” বাহির হইতে কে উত্তর দিল, ‘বলি তোরাই কি এন্লা-এন্লা রাস-লীলা করবি—বুড়ীকে কি নিবিনে?’ ও হো, এ যে, চেনা গলা। সকলে চিনিল, ডাক্তারঠাকুর-দিদি—তবু রক্ষে!

‘এস এস চন্দ্রাবলি দিদি এস,’ বলিয়া কুসুম দরজা খুলিয়া দিল। হাসিতে হাসিতে ডাক্তার-গিন্নি গৃহে প্রবেশ করিলেন—ও ভাত, খাট হইতে নামিয়া, ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন! ঠাকুরাণী আশীর্বাদ ও বশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে, ও ভাত বলিলেন, ‘বাগানের যে এত দেয়ী।’

ডাঃ গিঃ। ‘আর ভাই, আমাদের ভাণ্ডা বাগান, এখন আর জোগান দেওয়া ভার।’ তার পর ইন্দুর দিকে চাহিয়া, “ও কিলো ‘বাগান’ আমার কাছে আবার এত দজ্জা কেন? এলো লজ্জা রাখ্” বলিতে বলিতে তাহাকে ধরিয়া আপনার কাছে আনিলেন। ইন্দু জড়সড় হইয়া, ঠাকুরাণী-দিদির কাছে ঘেসিয়া বসিল। ও ভাত, ঠাকুরাণী দিদির অহুমতি ক্রমে আবার স্বস্থানে গিয়া বসি-

লেন। তখন, ডাক্তারগিন্নি, কুসুমের দিকে চাটাই বলিলেন, “হাঁলা আতরনানি, আনাকে ডেকে আনতে নেই কি ? তোরা গেলিনে দেখে আমি শেষে গন্ধে গন্ধে এলাম।” প্রভাত হাসিয়া বলিল, “ঠান্দিদির ব্রাশশক্তিটা ত বড় প্রখর।” ডাক্তারগিন্নি একটু চাপা হাসি হাসিয়া বলিলেন, “তুমি যখন এসে বাগানে পড়েছ, তখন আমি না এলে কি আর রক্ষা ছিল।”

প্রভাত বুঝিলেন, উপযুক্ত উত্তর হইয়াছে।

ডাক্তারগিন্নি বলিয়াই বলিলেন, “তুমিত ভারি নির্ভর, এতদিন কি ভুলে থাকতে হয় ? পাট অভাবে, আমার সাধের সুন্দর বাগান যেন শুকিয়ে উঠেছে !- তুমি কি রকম মালী ? মালী উপস্থিত না থাকলে, ফুটন্ত বাগানে কি দশা হয়, তা কি জান না ?

এবার ইন্দু ঠাকুরাণীদিদির দিকে ত্রুটু করিল। প্রভাত বলিলেন, “ওজ্ঞ ত এতক্ষণ অনেক ‘খোঁটা’ খেলান।”

ডাঃ গিঃ। খোঁটার এখন হয়েছে কি ?

প্রভাত। তা বটে! যে রকম দেখছি তাতে কেবল খোঁটার পার পেলে বাঁচি, আর কিছু খেতে না হয়।

সকলে হাসিয়া উঠিল ইন্দুও যুহু হাসিল, তার পর, ঘোমটার ভিতর হইতে একটু কোপকুটিল কটাক্ষে একবার স্বামীর পানে চাহিল। ডাক্তার-গিন্নি আবার বলিলেন, “দেখ নাতজামাই, একটা মজা শুনেছ! ও মানে তুমিত ত ভাই, আসবো বসে এলে না, ইন্দুর যে হুখ! একদিন দেখি, হেনকে আর শৈলকে ইন্দু শ্লোক শেখাচ্ছে; সে শ্লোকটা কেন শেখাচ্ছিল, তুমি শুন্লেই বুঝবে এখন”—বলিয়া ডাক্তারগিন্নি দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়া শৈলকে ধরিয়া আনিলেন। হেম পলাইয়া গেল। শৈল ইন্দুর জ্ঞাতি-ভগ্নী, তারাও সব দল বাঁধিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। শৈলকে ধরিয়া আনিয়া ডাক্তারগিন্নি বলিলেন, “বল ত শৈল—সে দিন তোর ইন্দুদিদি যে শ্লোকটা শেখাচ্ছিল, সেটা বল ত? পুতুল আর পুতুলের গয়না দেব এখন।” ইন্দু হাত নাড়িয়া, ঘোমটার ভিতর হইতে চোক

পাকাইয়া শৈলকে বারণ করিল—কিন্তু সে গুহুলের
লোভ পাইয়াছে, নিষেধ শুনিবে কেন? শৈল তখন
হাঁফাইতে হাঁফাইতে আব-আধ কথায় বলিতে আরম্ভ
করিল—

“বালিকা ছিলাম, ছিলাম ভাল সই;

ছিল না স্বপ্ন-অভিলাষ।

পতি চিন্তাম না, ও রস জান্তান না,

জংপন্ন ছিল অপ্রকাশ।

এখন, সেই শতদল মুদিত কমল, কাল পেয়ে ফুটিল,

পদ্মের নধু পদ্মে রেখে ভুঙ্গ উড়ে গেল।

একে”——

আর বলা হ'ল না। ইন্দু আসিয়া শৈলর
মুখ চাপিয়া ধরিল! আর কাণে কাণে কি
বলিল—শৈল “আচ্ছা” বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।
ডাক্তারগিরি বলিলেন,—ওকে তাড়িয়ে দিল
কেন লো বাগান? এখন আবার এত লজ্জা
কেন?”

তার পর অল্প কথা পড়িল। এদিকে বেলা
যায় যায় দেখিয়া ক্রমে আসর ভাঙ্গিতে আরম্ভ

হইল। তখন প্রজাতের জল খাবারের ডাক
পড়িল। প্রভাত উঠিলেন। আহ্ন, আমরাও
আজ এইখানে বিদায় গ্রহণ করি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

—১৫—

“জোর সে হাঁকাও” প্রভাত বারংবার কোচ-
ম্যানকে তাড়া দিতেছেন। আজ আটটার টোশ
ধরিয়া এগারটার, পূর্বে আফিস বাইতেই হইবে,
নতুবা—সহসা প্রভাতের মানসচক্ষে বড় সাহেবের
রোষরক্ত বদনমণ্ডল উদিত হইল, প্রভাত তখন
বাকুলভাবে বিগুণ আগ্রহে আবার হাঁকিলেন,
“জন্দি হাঁকাও।” বক্সিসের লোভে কোচম্যান
চাবুক হাঁকড়াইয়া কিহু জন্দি হাঁকাইতে লাগিল
সত্য, কিন্তু অশ্বের বেগ তাহাতে বড় বাড়িল না ;
প্রভাত উৎসুকনয়নে ঘড়ি খুলিয়া, ষ্টেশনের দিকে
একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া কেবল আফিসের চিহ্নাতেই
আকুল হইতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে
কোন গাড়ির রসিক গাড়োয়ান গাহিয়া উঠিল,—

“বিরহিণী বিবি আমার বাঁধে নাকো চুল।”

এ সঙ্গীতে প্রভাতের হৃদয় যেন স্পন্দিত হইল।
সেই বিদায়ের দৃশ্য, ইন্দুর সেই ছলছল জলভরা
অধিহুটি, যেন তাঁর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

ইন্দু যে তাঁকে আর একটি দিনের জন্ত থাকিতে অপরোধ করিয়াছিল, কিন্তু প্রভাত, বাজিকার সে আশার রক্ষা করিতে পারেন না। সহসা প্রভাত বড় অভ্যমনক হইলেন, আফিন, সাহেব, মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া গেলেন। ইন্দুর স্বতি, হৃদয়সিদ্ধ উদ্বেলিত করিয়া দিল।

কবি বলিয়াছেন, জীবন অস্থায়ী, ইহা হুথের বাটে, কিন্তু অবিকতর কঠোর কথা, জীবনের উপভোগ্য হুথের দিন আরও ক্ষণিক ! এ উক্তি সত্যতা প্রভাত আজ মর্মে মর্মে বুঝিতেছিলেন। হায় দাসহ ! আবার দাসহ,—প্রভাত তখন ঘড়ির দিক দৃষ্টিপাত করিয়া আকুলভাবে আবার ডাকিলেন, “কোচ্‌ম্যান্—”

* * * * *

আর ইন্দু ? সমবয়স্কদের সহিত ইন্দুর সে খেলা আর ভাল লাগে না, কথা ক'হবার ভাগে ইন্দুর মুখে যে হাসি, আপনি কুটিয়া উঠিত, সে হাসি আর আসে না, ইন্দু সে উচ্চহাসি আর হাসে না, দুই দিনে সে যেন কত বিজ্ঞ হইয়া

পড়িয়াছে, সে সদা-প্রফুল্ল মুখে, যেন বিষাদের ছায়া
 পড়িয়াছে, সে শরভের জোৎস্না, যেন মেঘে ঢাকি-
 য়াছে, সে কাঁচা বাঁশে যেন ঘুণ ধরিয়াছে। সতাই
 যেন এতদিন ইন্দুর “হৃৎ-পদ্ম ছিল অপ্রকাশ।”
 কিন্তু যে ভঙ্গের মধুর বদ্বারে সে হৃদয় কোরক
 বিকশিত হইল, কোথায় সে আজ? হায়, পথিক!
 যেন তুমি হৃদিনের জন্ত অসিয়াছিলে?

— — —

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

—১৫—

সেই ত সব, সেই জনক-জননী, সেই ভাই-
ভগিনী, সেই সমবয়স্ক সঙ্গিনী, সবই ত সেই—
ভবে ইন্দুর এ সবে আর সে তন্ময়তা নাই কেন ?

“ইন্দুর কি হৈল অন্তরেতে বাধা ?”

ইন্দুর হৃদয়ে এ আকাজকা, এ অভাব, এ
অপূর্ণতা, সহসা কে জাগাইয়া দিল ?

ইন্দু শুধু পথ চাহিয়া থাকে—কবে স্বামীর
হস্তাক্ষর পাইবে, শুধু দিন গণিতে থাকে—কবে
পূজার ছুটি আসিবে, শুধু ভাবে—কবে আবার
হৃদয়ে মিলিবে !

আশাপথ চাহিতে চাহিতে, দীর্ঘ দিন গণিতে
'গণিতে, ঠাকুরাণীদিদিদের বিদ্রূপ সহিতে সহিতে,
আর হৃদয়ের বেদনা বহিতে বহিতে, ইন্দুর দিন
কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটির
দিন নিকটে আসিল,—ইন্দুর মলিন মুখে হাসি
ফুটিল।

পরংকাল। দিগন্তবিস্তৃত, বায়ু-হিম্মাল-বিস্তৃত

শ্রামলশত্ৰুজ দেখিতে দেখিতে ৫ মন মুন্দ হইয়া যায়। এ যেন বিকৃতনাগরবক্ষে শ্রামতরসরাজির অশ্রুলালা! গ্রামে গ্রামে অর্থ, বট, অগ্র, বহুল প্রভৃতি বৃক্ষনাগ কেমন সতেজ, তাহাদের শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, চিৎন ঘোবন উদ্ভাসিত। মাঝে মাঝে স্তবকে স্তবকে 'রাধা-চূড়া-পুষ্পের' গেহিত আভা শ্রামলশত্ৰুর অবকাশ-পথে পড়িয়া মন হরণ করিতেছে। বিল-খাল-পুষ্করী সবই কাণায় কাণায় পূরিয়া উঠিয়াছে! এই সরিং-লীতলা, শস্ত্র শ্রামলা পত্র-পুষ্প ভূষিতা শরৎ-রাজার পরিপূর্ণ শোভা দেখিতে দেখিতে, হৃদয়ে যেন কি এক নূতন শক্তির সঞ্চার হয়! আশায় আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় মাতিয়া উঠে। আর সেই 'শক্তিসাধনার' সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী আত্মীয়ের জন্ত বাঙালীর মন আকুল হইয়া পড়ে। বিশেষত জননীর প্রাণ তখন পরগৃহ বাসিনী, প্রাণ-প্রতিমা নন্দিনীর জন্ত নিতাস্তই অগীর হয়। তখন শত জননীর ব্যাচুলতাপূর্ণ কক্ষ-অগমনী গীতি বাংলার গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে থাকে। এমন

মনে কি কোন জননী প্রাণ ধরিয়া 'ঘরের মেয়েকে পরের বাড়ী' পাঠাইতে পারেন? তাই আজ ইন্দু জননীর এত দুঃখ! "বেয়ান-মাগীর কি আবেল না, পূজা সান্নে করে কিনা নিতে পাঠিয়েছে। তার কি পেটের মেয়ে নাই! মায়ের বথা কি সে জানে না?" কিঙ্ক হায়! মেয়ের মায়ের যে সবই অরণ্যো রোদন! যে ইন্দু, এতদিন স্বামীদর্শন ভালসায় আশাপথ চাহিয়াছিল, আশুনিলনের ভরসায় উঃক্লম হইতেছিল, আজ সহসা তাহার এ কি পরিবর্তন! ক্ষুধিত-হৃদয়া ইন্দু আজ চির বাহিতের নিকট বাইতেছে, এ দুখের দিনে তাহার এ দুঃখ কেন? ইন্দু মার গলা ধরিয়া, ছোট ভাইটিকে কোলে করিয়া, সঙ্গিনীর পাশে দাঁড়াইয়া, অকপটে চক্ষুর জল ফেলিতেছে, চক্ষুর জল বুক ভাসিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার চকু ফুলিয়াছে! কে জানে, এ রহস্য কেমন, কে বুঝে রমণীর মন!

যাত্রার সন্ধ্যা বহিয়া যায় দেখিয়া, মেয়ের চক্ষুর জল মুছ ইতে মুছাইতে, নাইকে পাখীতে তুলিয়া

দিলেন। অলক্ষণ জানিয়াও যাত্রাকালে না চক্কর
কল স বরণ করিতে পারিলেন না! কিঙ্ক

“মা, তুমি বোকা নহে কেন কেঁদে মর।

ভেবে দেখ মা, তুমি কার স্বর কর!”

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।



শারদীয়া পূজার নোট আর দুই দিন বাকী ।
আগ্নি আকিন করিয়া প্রভাতের ছুটি । অত্ৰবার
ছুটি হয় বারাননু, এবার বড়-সাহেব দক্ষা করিয়া,
জোড়াতাড়ি দিয়া, দুটটা দিন-তই বাড়াইয়া দিয়া-
ছেন,—মাননের কথা আর কাজ কি ? বড়-
সাহেবের জয় জয়কার হোক ।

প্রভাত আফিস হইতে বাসায় আসিয়া তাড়া-
তাড়ি হাত মুখ ধুইয়া, বংকিঞ্চিং জলযোগ করিয়া
লইলেন ;—লজ্জার কথা, বাড়ী বাইবার আশোদে,
এ বয়সেও প্রভাতের উদয় পুরিয়া উঠিল ।
চিরপ্রথাগী কেরানী সারাট বৎসর পরে বাড়ী বাই-
তেছে, তার আফ্লাদ তোমরা সবাই বুঝিবে কি ?
কিপ্রহণ্ডে জিনিবপত্র গুছাইয়া লইয়া “নদী যথা
ধার সিঁধু গানে”—প্রভাত গৃহোদ্যেবে ছুটিলেন ।

হাওড়া ষ্টেশনে ঢুকিতে না ঢুকিতে একটা অক্ষুট জনকোলাল শুনা গেল। বোম্ব হইল যেন সমুদ্র গজিতেছে। ষ্টেশনে, টিকিট ঘরে, লোকে লোকাবণা; টিকিট লইয়া প্রভাত তখনই গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি কিন্তু সব ভরপুর। বহুকষ্টে বসিবার স্থান মিলিল। বে স্বর্গে উঠিতেছে, সে সিড়ির ভয় করে না,—কাজেই প্রভাতও এ কষ্ট গায়ে মাখলেন না। একটু পরে গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল; তখন, ভীতা ফণিনীর মত তারবেগে গাড়ি ছুটিল।

প্রভাতের গাড়িতে অধিকাংশই গৃহযাত্রী-বাঙালী। কেহ বালক, কেহ বৃদ্ধ, কেহ যুবক। কাহারও জন্তু মেহমরী জননী, পথ চাহিয়া চাহিয়া আছেন,—কবে তাঁহার অঞ্চলের নিধি, কাঙালের সোণা বিদেশ হইতে আসিবে! কাহারও পুত্র-কন্যা, আত্মীয় বাহুবান্ধব আশাপথ ধরিয়া আছেন; কাহারও বা প্রাণিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন গণিতেছেন। কবে আবার তাঁহার সেই প্রবাসক্লিষ্ট, হৃদয়-সংস্রব স্বামী গৃহে ফিরিবেন। হায়! আবার

কর্তাদনে, সেট দিরহ বিবরা পথিকবধ, খঁড়র বকে
মাথা রাখিয়া, সারা বছরের জ্বখ-বসনা ভুলি-
বেন।

আনন্দময়ী নার আগমনে, বঙ্গ যে এত আনন্দ
উল্লাস, তৃষ্ণা বা শিখড়ানর মিলন আশাই ইহার
পোহান কানশ ! ক্রমে গাড়ি দেশে পর দেশে
খানিতে থামিতে প্রভাতর গন্তব্য দেশে উপস্থিত
হইল, প্রভাত নামিয়া পড়িলেন। রাত্রি তখন
আটটা। দেশের বাহিরে, প্রভাতদের গ্রামস্থ
তিনটি স্কুলের দ্বারের সঙ্গে দেখা হইল ; একজন
কিশোর-বয়স্ক, আর দুটি বালক। তাহারা তিন-
জনেই একপরিবারভক্ত, কলিকাতায় থাকিয়া
পড়াশুনা করেন। সম্প্রতি ছুটিতে বাড়ী যাইতে-
ছেন। ইহার চারিজনে একখানি ঘোড়ার গাড়ি
ভাড়া করিবেন, স্থির হইল। বহু গ্রাহক, এ
দিকে গাড়ি কন, গাড়োয়ানদের স্ততরাং পোয়া-
বারো ! অন্তসময় তাহারা দুটিয়া আসিয়া হাতের
বাগ্ বহিয়া গাড়িতে লইয়া যায়, আজ আর
তাহাদের মাটিতে পা পড়ে না। তারা কোচ্বায়ে

শ্রুতীর ভাবে সমান বসিয়া রহিল। কিন্তু গরজ বড়
 বালাই; প্রভাত নিজের দায়ে অগত্যা মহেশ্বরের
 সেই উপদেশ-বাক্য স্মরণ করিলেন। গাড়োয়ানেরা
 কেহ অগ্রসর হয় না দেখিয়া, প্রভাতই শেষ, গাড়ির
 কাছে হাজির হইলেন। অন্য সত্তর ডই টাকার
 মধ্যেই গাড়ি মিলে, কিন্তু অল্প শিকার মিলিয়াছে
 বুঝিয়া কেহ আর পাঁচ-টাকার কমে বাহতে
 স্বীকৃত হইল না। তাই স্বীকার করিয়া প্রভাতের
 গাড়িতে উঠিলেন; গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিল;
 পক্ষিরাজবর, গজেন্দ্র গতিতে ছুটিলেন। তাহাদের
 প্রতি পদক্ষেপে, একটা গভীর ঊদাস ও নির্লিপ্ত-
 তায় ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হায়! এষ্ট
 অধিনীকুমার-যুগলেরও বুঝি গাড়োয়ানদের মত
 পারাভারি হইয়াছে!

বাই হোক, কোনরূপে প্রভাত রাত্রি এগারটার
 সময় বধ্যস্থানে পৌঁছিলেন। এইবার নৌকার
 বাইতে হইবে, এখান হইতে প্রভাতদের বাড়ী
 স্নাতকোশ, তবে অলপধে কিছু ঘুরিয়া বাইতে হয়।

স্বৈরিন চতুর্থী : স্তব্রাং জোংরা অনেকক্ষণ

ভুবিয়া গিয়াছে রাজি কিছু অন্ধকার, তবে ঘোর
নহে; সেই তরল অন্ধকার ভেদ করিয়া তারকা-
রাজি অগ্নি অগ্নি করণ দিতেছিল। প্রভাত তখনই
নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। অল্পকূল বাতাস বহিতে-
ছিল, মাঝিরা পাল তুলিয়া দিল, সেই নিশীথে
অনন্ত আকাশ তলে, প্রশান্ত ভাগীরথী বক্ষে, পাল-
ভরা নৌকা তরতর বেগে, মুক্তপক্ষ কলহংসীর মত
চলিল। আগ্নে, বর্ষার সে দুর্দমনীর চাকলা
নাই, কিন্তু ভাগীরথী এখনও কাণায় কাণায় পূর্ণ।
যৌবনের মদ্যতা গিয়াছে, কিন্তু যৌবন আজিও চল-
চল। গঙ্গার উত্তরকূলের দূরস্থ গ্রামগুলি কুয়াসা-
চ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। গাছপালা সবই
ছায়া ছায়া, বেন চিত্তাৰ্পিত! দেখিতে বড়ই স্নন্দব,
কোপাও বা অদূরে দুই-একটা সৌখশ্রেণী পড়িয়া
আছে, কোনটির বা মুক্তবাতায়নপথে আলো
দেখা যাইতেছে। দূরে মাঝিমান্নারা সারি গাহিয়া
চলিয়াছে, গান বুঝা যায় না, কিন্তু সেই গভীর
নিস্তরু রজনীতে সঙ্গীতের সেই শেষভাগ বড়ই
মধুর শুনাইতেছিল!—আর প্রভাতের মনে যে

সঙ্গীত বাজিতেছিল, তাহা আরও মধুর! ক্রমে প্রভাতের তন্দ্রা আসিল, তন্দ্রা স্বপ্নময়, আর স্বপ্নে যে কি-নয়, তাহা বলিতে হইবে কি?

কখন প্রভাত হইয়াছিল, প্রভাত জানিতে পারেন নাই! বেলা তিন চারি দণ্ডের সময় নান্দিতের ডাকে প্রভাতের ঘুম ভাঙিয়া গেল। নান্দিতা বলিতেছে, “বাবু! ঘাটে এসেছি, উঠুন—কথাটা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,—

আকুল করিল তার প্রাণ।

প্রভাত আর কি স্থির থাকিতে পারেন? তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গে যে বালক-দুইটি ছিল, তাহারা নৌকা ঘাটে লাগিবারাত্রই লাফ দিয়া ঘাটে উঠিয়াছেন—তারে উঠিতে না উঠিতে তাহারা কতদূরে চলিয়া গেল।

গঙ্গার ধার হইতে প্রভাতদের বাড়ী এক-পোয়া পথ। গ্রামের নীচেই বিল, কিন্তু ঘুরিয়া সেই বিনপথে গেলে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। প্রভাত ততটা ঘুরিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

বালক-দুইটি চলিয়া গেলে, প্রভাত সেই

কিশোরটিকে বলিলেন—“কই উপেন, তুমি যে ওদের সঙ্গে গেলে না?” সে কোন উত্তর দিল না, কেবল প্রভাতের দিকে চাহিল, চাহিয়া একটু হাসিল। সে হাসি ঔদাস্যের! তাহার মত বয়সে সকলেরই একদিন এইরূপ উদাসভাব আসে। বাল্যকালে পূজা বলিয়া, গৃহ বলিয়া, যে একটা দুর্দমনীয় টান থাকে, আমোদে যত উৎসাহ থাকে, বয়সে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া আসে। শেষে কিশোর বয়সে একেবারেই কমিয়া যায়। তখন একটা উদাসভাব, হৃদয় ছাইয়া ফেলে। বাল্যকালের সে সব আমোদে মন আর মাতে না, সে নব বাঁধনে আর তেমন টান থাকে না, যেন কি-একটা অভাবে, কি-একটা শূন্যতার হৃদয় সদাই খাঁ-খাঁ করিয়া বেড়ায়। পুরাতনের কিছুতেই আর তাহা পূর্ণ হয় না। শেষ আর-এক নূতন বন্ধন হয়। সে বন্ধনে শিথিল গ্রন্থি সব আবার দৃঢ় হইয়া পড়ে, জগৎ আবার মেহময় হইয়া উঠে; নৈতর পর বসন্তের উদয় হয়

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

১৪৮

শেভার বারী প্রবেশ করিয়াত না করিয়াও
‘কাকাবাবু দাদা মনোজ, আমবা মনাই খাট’
এনিয়া প্রভাতের সাতপায়ে ত তইসি দটি চুটরা
ঝাড়ে জাঙ্গিল। শেভার অসীম মেহের করিয়া
সন্দেশ জাঙ্গিল নাই, মন মার চিত্ত অপ্রস্থিত
হইলেন। কিন্তু প্রভাত সন্দেশ দিত না পারি লক
বালক বালিকা দ্বন্দ্বের উৎসাহভঙ্গ হইল না।
সাহার’ কেহ কুপাইরা প্রভাতের কোল উঠিল,
কেহ বা হাত ধরিয়া ‘কাকা এসেছ গো’ ‘কাকা
এসেছ গো’ রবে বাড়ী হোলপাড় করিতে করিতে
প্রভাতকে অন্তরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল;
তখন একে একে প্রভাতের মা, ভগিনী, দিসি
মাতা, ঠাকুরমাতা প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া
দাঁড়াইলেন; গুরুজনদিগকে স্বথারীতি প্রণাম

কঠিনে পর ভগিনী প্রভাতকে বসিবার জায় এক-
খানি মাহুর বিছাটয়া দিলেন । বালক-বাগিকার
দলও তখন কেহ প্রভাতের কোণে, কেহ পাশে
বসিল । না খাবার আনিতে গেলেন, আর সকলে
তাহা বসিয়া গল্প করিতে বাগিলেন ; অনেকদিনের
পর মেয়ে-বালকি ও ভক্তির প্রতিমা-প্রতি দেখিয়া
প্রভাতের হৃদয় আনন্দে উড়লিফা উঠিল ; আমরা
সত্য কথা লুকাইব না, কথা নহিলে কঠিন
প্রভাত মাঝে মাঝে অত্যন্ত হতাশে ছিলেন ।
আহার চকল চক কোন একটি নেপথ্যদ্বারের
উত্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছিল । আরও একটি
উৎসুক দৃষ্টি যে, কদুরে অন্তরালের ছিজপাথে
ঘনপাচ্ছায়াহলে চকল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা
প্রভাতের অন্তর জানিত ।

জল খাওয়ার পর প্রভাত বনুবাধবদের সহিত
দেখা করিতে বাহির হইলেন । পূজায় অনেকের
বাটী আসিয়াছেন, একে একে প্রায় উপস্থিত
সকলের সঙ্গেই দেখা করিলেন ।

বাল কালের সেই বাধাঘাট, সেই বটগাছ, সেই

বকুলতলা, সকলই দেখিলেন। শৈশবের কত কথা মনে পড়িল, হায়, আজ সে সব দিন কোথায়? আর সেই শৈশবের সেই যে সঙ্গী, তারাই বা আজ কোথায়? কেহ দেশান্তরে, বড়কাল দেখা নাই, কেহ লোকান্তরে, এ জীবনে আর দেখিবার আশা নাই!

দেখাসাক্ষাতে, আহাৰে, নিদ্রায়, গল্পে, গানে, সনাত্ত দিন কাটিয়া গেল; রাত্রি নরটার পর প্রভাত আহাৰাদি কারয়া শয়ন-গৃহে গেলেন! আজ এ পবাস্তু প্রভাত তাঁর সেই নয়নানন্দদামিনীর সাক্ষাৎ পান নাই। বালিকা বা যুবতী বয়স প্রথম যুগরবাগী আসিয়া দিবসে স্থানি সন্দর্শন পল্লীগানে বড় কঠিন কথা! গৃহে আসিয়া প্রভাত প্রায় আবেদ্য টা শুইয়া রহিলেন। পাতাটি নড়িলে, বায়ু একটু নশবে বহিলে তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, কিন্তু রুথা আশা! তখনস্তাঁর মনে হইতে লাগিল—

“জানে কাঁদি তার তরে,

তবু সে বিলম্ব করে—

রুমী নিদ্রা!”

কাজকর্ম সমাধা করিয়া ইদুর আসিতে এ
বিলম্বটুকু হইতেছে বুঝিয়াও প্রভাতের অনুক্ষণ
চঞ্চল হইয়া উঠিল, ক্রমে যেন শয্যা-কণ্টক উপস্থিত
হইল, প্রভাত পাশ ফিরাইয়া শুইলেন ; বীরে বীরে
সহসা কে আসিয়া প্রভাতের চক্ষু টিপিয়া ধরিল !—

কি কোমল স্পর্শ!

—

নবন পরিচ্ছেদ ।



প্রভাতদের বাজীতে পূজা কর। আজ সপ্তমী-
পূজা। পূজার বাজ বাজিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে
বালক-বালিকাগণ “আঙা কাপল” পরিয়া পূজা
দেখিতে ছুটিয়াছে।

সকাল গর আরতি। পুনোত্তীর্ণতার যথাসময়ে
পঞ্চপ্রদীপহস্ত আরতি অবস্তু করিলেন। তাঁহার
কন্ঠের সেই কলার্কৌশলময় নগ্নালন দেখিবাব
যোগ্য। প্রতিমার নিকটে ঘনঘন পূপদ্রুনা জ্বালাত
তইতেছিল—উদয় পার্শ্বে সারি বিনীত চায়র-বক্তন
চলিতেছিল, মাঝে মাঝে লাল নীল আলোয় চাউ-
সগুপ উজ্জল হইরা উঠিতেছিল। কাশর ঘণ্টার
রবে দিক পুরিয়া উঠিয়াছিল; সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-
ঢোল শানাই বাজিতেছিল। অসংখ্য নবনারী
জ্বলিতরে, একদৃষ্টে প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছে,
এমনে এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মনে কেমন-একটা

পবিত্রভাব আসে, ভক্তিতরে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে ।

পরদিন অষ্টমীপূজা । অষ্টবার সন্ধিপূজা গভীর নিশীথে হইয়া থাকে, এবার আরতির সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল । আজ পূজার জন্মজমাটা আরও কিছু বেশী রকমের ।

নবমীর দিন লোকজন ষাওয়াইতেই কাটিল গেল । তার পর বিজয়া দশমী ; বৈকালে প্রতিমা-বরণ হইল । আজ নিজ গ্রাম ও আশপাশ হইতে অনেক লোক, বিসর্জন দেখিতে আসিয়াছে ।

সে গ্রামে আরও দুইখানি পূজা হইত ! তিন-খানি প্রতিমা একত্রে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া একসঙ্গে বিসর্জন দেওয়ার প্রথা । গ্রামের প্রান্তেই বিল । সেই বিলে প্রতিমা বিসর্জন হয় । বিল এখনও জলে পূর্ণ, সুতরাং প্রতিমা লইয়া “বাচ্‌খেলার” বড় সুবিধা । প্রভাতেরাও নৌকাবিহারের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না । প্রকাণ্ড বিল, বিলের এক ধার হইতে অস্ত্র-ধার স্পষ্ট নদর চলে না । চারিদিকে কেবল স্থির জলরাশি, নাঝে নাঝে শব্দহীন

শুভ্রবৃক্ষাদির শাখা নাত্র জাগিয়াছে । সেই সব শাখায় শাখায় শুভ্রনলপাত্রর অন্তরালে বক সারসাদি বসিয়া আছে ! কোথাও বা কলহংস, কারঙব, চক্রবাক মিথুন প্রভৃতি জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতে-ছিল -- সন্ধ্যা সন্ধ্যাগত দেখিয়া তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে কুলার উদ্দেশে চলিয়া গেল ।

সন্ধ্যার পর বিসর্জন দিয়া প্রভাতেরা নৌকা ফিরাইলেন । কূলে পৌছিবার পূর্বেই জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল । কোমুদী কিরণসম্পাতে জলরাশির শোভা দেখিতে দেখিতে সকলে উপরে উঠিলেন । তখন শানারে পূর্ববী রাগিনীতে বিসর্জনের গান গাহিতেছিল — সেই গানের সঙ্গে তখনকার প্রাণের সুর মিলিল ।

গৃহে ফিরিতে একটু রাত্রি হইল । তার পর সকল পরিবার একত্র হইয়া সম্বন্ধ অনুসারে পরস্পর প্রণাম, আলিঙ্গন, আশীর্বাদ চলিতে লাগিল । শেষ, গ্রামস্থ স্বজাতি, কুটুম্ব, আত্মীয় সকলের বাটীতে বিজয়ার প্রণাম-উদ্দেশে সকলে বাহির হ. লেন । আজ আর শত্রুনিত্রভেদ নাই, শত্রু শত্রুতা ভুলিয়া, মহা-

শত্রুকে আলিঙ্গন ক'রতেছে, আজ সকলের মন বেন শান্তি ও ক্ষমার পূর্ণ।

আহারাতির পর প্রভাত শয়নগৃহে বসিষ্ট আছেন. সহসা তাঁর গৃহিণী আসিয়া ঢিপ করিয়া একটি প্রণাম করিলেন। হাল ফাসানে, গৃহিণী-কুলের নিকট প্রণাম আর বড় একটা পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় প্রভাত প্রথমে একটু বিস্মিত হইরাছিলেন। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, ঐতিদানে প্রভাতও তাঁর কর্তব্যসাধন করিলেন।

আজ পূর্ণিমা। রাত্রে ওপাড়ায় রায়েদের বাটীতে যাত্রা হইবে। প্রভাত এখন একটা রাত্রিও নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু কি করেন, বঙ্গবান্ধবদের অগ্রোধ ও বিদ্ৰোপে পড়িয়া যাত্রা শুনিতে যাইতে হইল। রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিলেন। শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া শিকল নাড়িলেন, দরজা খুলিয়া ঠাকুরমাতা বাহির হইলেন, একটু রহস্ত করিতেও ছাড়িলেন না। প্রভাত ঘরে গিয়া দেখিলেন, তাঁর গৃহিণী নিদ্রাভিভূতা। কয়েকদিন

উপস্থিতির রাত্রি জাগ্রদা আজ এই অবকাশে একশ' ঘন, হয় লইতেছেন। এতক্ষণ তাঁকুরনা তার কাছে ছিলেন, শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়াই তাঁর মৃদু জাউয়াছিল, তিনি আর ইন্দুর ঘন না ভাঙাইয়া ভয়'র পূ'জা দিলেন।

মুক্তবাস্তবনপথে পূ'র্নচন্দ্রের কিরণ আসিয়া শয্যা'র পড়িয়াছিল! প্রভাত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই শরৎজ্যোৎস্নার সহিত তাঁহার গৃহজ্যোৎস্নার মিলন দেখিতেছিলেন।

* * * * *

কেনে ছুটির দিন কুরাইল। আজ রাত্রি দশটার মত প্রভাতকে কলিকাতার রওনা হইতে হইবে।

প্রভাত স্নাত্ত দিন কোথাও বড় একটা বাহির হইবেন না—না, পিগিনা, ভগিনী, ইহাদের কাছে-কাছেই রহিলেন। আর সন্ধ্যার পরই জাহার করিয়া শয়ন করিতে গেলেন।

প্রভাত বাওয়ার একটু পরেই গৃহিণী উপস্থিত হইলেন। সেই স্বভাব-প্রকৃতি মুখস্থানি আজ বড় বিকল।

অল্প দিনের অপেক্ষা দশটা আজ যেন ছ'টার
ষটা পূর্বে বাজিল। বিদায়কাদীন মিলন যখন
নিবিড়তম, তখন কে ডাকিল,—

“বাবু, মাঝি এসেছে।”

অভ্যন্তর একে একে সকলের কাছে বিদায়
হইয়া নোকার উঠিলেন। নোকা ছাড়িয়া দিল

—

দশম পরিচ্ছেদ

—১৫—

কথায় বলে, “বয়স যায় না জল যায়” সেটা কিন্তু নিতান্ত মিথ্যা নহে। যখন ইন্দুর বিবাহ হইল, তখন ত তার সহোদরা চাণুর, বয়স সবেমাত্র আট। ইন্দুর পিতা, ইন্দুকে পাত্রস্থ করিয়া ভাবিয়াছিলেন, ‘আঃ কর বংশরের মত ত ভাবনা-চিন্তা হইতে বাঁচা গেল!’ কিন্তু তিনটা বংশর যে দেখিতে দেখিতে অতীত হইল! সেই সে দিনকার মেয়ে চাক, ইহারই মধ্যে বিবাহের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু স্ত্রপাতের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, পিতা বীরে-স্বস্ত্রে চেষ্টা করিতেছেন, আর না, তাঁর উদ্বিগ্নের কথা আর কাজ কি—চক্ষে নিদ্রা নাই, আহায়ে রুচি নাই, গৃহকর্মে তন্ময়তা নাই, মুখেরও কামাই নাই! কেনন করিয়া জাতি-কুল রক্ষা হইবে, ধর্ম থাকিবে, তিনি এই ভাবনাতেই অবীর! বার বছরের মেয়ে সার গলায়, সে কেনন করিয়া স্থির থাকে, গৃহিণী ত তাহা বুঝিতেই

পারেন না, কাজেই বাস্তবাবে কর্ত্তা সর্বদাই জঙ্ক-
রিত ! কর্ত্তা ত আজকাল অন্তরমহলে দিবাভাগে
বিশেষ প্রয়োজন হিন্ন প্রায়ই প্রবেশ করেন না,
আজরাতে নথনাড়ার ভার অধিকক্ষণ অন্তরে
তিচ্ছেন না । রাত্রিতে গৃহিণীর শয়নগৃহে প্রবেশের
পূর্বেই নিদ্রার অভিভূত হন ! সহজে নিদ্রা না
আসিলে কপটনিদ্রারও আশ্রয় লেন ! কিন্তু এত
করিয়াও গৃহিণীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়
নাই । মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চলে না, কিন্তু
কল্পাদায়গত জননী সে বিধি-নিষেধের ধার ধারেন
না । ঘুনাইয়াও কর্ত্তার নিস্তার নাই । গৃহিণী
তাহার বচনভাণ্ডের অক্ষয় ভূণ হইতে বাছিয়া
বাছিয়া এমন এমন বিষাক্ত বাণ প্রয়োগ করেন যে,
কপটনিদ্রাভিভূত কর্ত্তাটিকে মাঝে মাঝে অস্থিত
পাশমোড়ান দিতে হয় ! গৃহিণীর অত্যাচার ও অর্থ-
শূন্য কথার প্রতিবাদ করিবার লোভটাও সময়-
সময় কর্ত্তার অসংবরণীয় হইয়া উঠে, কিন্তু পাছে
তীর এই কপট বিদ্ভাটা ধরা পড়ে তাই কিল
খাইয়া কিল চুরি করেন, আর মনে মনে ভাবেন—

“কালী মিত্র বা নিমতলার ঘাট কোনটাই শরীর
অবিদিত নাই, তবে মরে যে আছি, এই দুঃখ!”
কিন্তু সব সময়েই যে কর্তার কৌশল খাটে, তা নয় ;
এক সময় না এক সময় তাঁকে গৃহিণীর হাতে
পড়িতেই হয়। তখন গৃহিণীর বচনে জোয়ার বহে,
মুখে ঠৈ ফোটে, চোখে আগুন ছোটে! তখন
কোথায় লাগে সুরেন্দ্র নাথের “এলোকোয়েন্স,”
আর কোথায় বা লাগে কালীবাবুর “রিজনিং”!
তা সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতাতেও দেশ জাগিল না—
আর গৃহিণীর বচনেও কর্তাকে টলাইতে পারিল
না। কর্তার কঠিন চরিত্র গৃহিণী কিছুতেই ভেদ
করিতে পারিলেন না, কারণ কর্তা একটু একেলে
লোক, “মেয়ের বার-বছর বয়স হলো ত কি
হলো?—ঐ তোমাদের পুরাকালের ‘সাবিত্রীর’
বিবাহ কত বয়সে হইয়াছিল?” কিন্তু কর্তার এ
সকল যুক্তি কে শুনে। গৃহিণী যখন কিছুতেই আর
কর্তাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন ব্রহ্মণীর
বে অমোঘ ব্রহ্মাঙ্ক—অশ্রু-কণা, একদিন তাহাই
ক্লেশগ করিলেন!—গিরি কাদিয়া কেবল যে ঝাট

ভিজাইলেন, তাহা নহে ; কর্তার মনও ভিজাইয়া দিলেন । অবলার বল চক্ষের জল, গৃহিণী বুঝি এতদিন তাহা ভুলিয়াছিলেন । তা গৃহিণীরই বা দোষ দিব কি ? আনাদের দেশের বড় বড় রাজ-নৈতিকেরাও এ কথা ভুলিয়াছেন । যে দুর্বল, তাহার বচন-বীরত্বে কি লাভ ? সুশীলার দাঁত-খামুটিতে কি কর্তাদের মন টলে ? আমাদের সম্বল যে চক্ষের জল ! “বালামাং রোদনং বলম্ ।” তা সে কথা যাক্, কথা হইতেছিল, চাকুর বিবাহ-সঙ্কটে ; কর্তা এক্ষণে বিশেষ করিয়া আত্মীয়-বন্ধুকে সুপাত্রের সন্ধান জ্ঞাত লিখিলেন, গৃহিণীর কিন্তু ইচ্ছা, কর্তা স্বয়ং কিছুদিন পাত্রের অনুসন্ধানে ফিরেন । তা কর্তা সে দিক্ দিয়া যান না, তাঁর কথা, বৃন্দাবনঃ পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি ! কিন্তু এতদিনে বুঝি চাকুর বিবাহের ফুল ফুটিল ! প্রভাত একটি সুপাত্র স্থির করিয়াছেন । পাত্রটি এককালে প্রভাতেরই সতীর্থ ছিলেন, চারি-বৎসর পূর্বে, ইন্দুর সহিত এই পাত্রের সম্বন্ধের কথাবার্তা হয়, কিন্তু তখন, এ পাত্রের বিবাহে মত ছিল

না,—তিনি লেখাপড়া শেষ না করিয়া, বিশেষতঃ
এগার বার বৎসরের মেয়ে, বিবাহ করিতে সম্মত
ছিলেন না। ‘ল’ পান্ করিয়া প্রাক্টন্ করিতে
করিতে এক্ষণে কিন্তু তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটি-
য়াছে। কিঞ্চিৎ নগদ অর্থ পাইলে এখন তিনি
পাত্রীর পিতাকে গৌরীদানের ফলভোগী করিতেও
কুণ্ঠিত নহেন !

পাঁচটা পান্ করা উকিল জামাই পাওয়া
গিয়াছে, জানিয়া গৃহিণী আহ্লাদে আটখানা
হইলেন—প্রভাতকে রাজরাজেশ্বর হইবার বস্ত্র
দিয়া স্বহস্তে পত্র দিলেন—“বাপাজী, সেই
পাত্রই স্থির ক’রো, টাকার জন্ত আটকাইবে
না—কিন্তু এই আষাঢ়মাসেই বিবাহ দিতে
হইবে।”

নগদ টাকার পরিমাণ শুনিয়া কর্ত্তা কিছু “ইত-
স্ততে” পড়িয়াছিলেন, সভয়ে গৃহিণীকে আপত্তির
একটু আভাসও দিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতেই
গৃহিণী দলিত ফণিনীর মত গর্জিয়া উঠিলেন।
দাক্ষণ ক্রোধের সহিত বলিলেন, “সেইখানেই মেয়ে

দেব, দেব, দেব, ওখানে যদি বা বিয়ে না হয়, তা' হ'লে কোন্ বেটী না গগায় দাড়ি দেয়।”

সর্বনাশ ! ইহার উপর আর কথা চলে না,

* * * *

সব ঠিকঠাক । আষাঢ়মাসেই বিবাহ।

—

একাদশ পরিচ্ছেদ ।



আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা অতীত। যেমন মেঘ,
তেমনি বৃষ্টি, বাতাসেরও বড় জোর। ইন্দু, ভগিনী
চারুকে “কনে” সাধাইতে সাজাইতে মাঝে মাঝে
যেন অগ্রমনস্ক হইতেছে। ইন্দুর এ ভাবান্তর আর
কেহ বুঝিতে না পারিলেও চারু বুঝিয়াছিল; সে
তার দিদির মনের ভাব লুফিয়া লইয়া বলিল,
“দিদি! কই প্রভাত বাবু ত এলেন না?” সে
সময় সেখানে আর কেহ ছিল না,—ইন্দু নিশ্বাসটা
একটু জোরে ফেলিয়া বলিল, “তাই ত ভাই,
আমিও ভাবছি, পথে না জানি কত কষ্টই পাঠেন *
ইন্দু তবু মনের সকল আশঙ্কা খুলিয়া বলিল না।
আজ ভগিনীর বিবাহের এ উৎসব, এ আমোদ যেন
তার নিকট কেমন ফাঁকফাঁক মনে হইতেছে, সে
যেন প্রাণ ঢালিয়া ইহাতে বোঝ দিতে পারিতেছে
না। ইন্দুর মাও ছই একবার প্রভাতের কথা
তুলিবেন। চারুর বিষে, বড়জামাই এলেন না, এ

অভিমানও করিলেন, ইন্দু কিন্তু জানিত, বিশেষ কোন বিব্র না ঘটিলে স্বামী আসিবেনই, সেইজন্যই তার এ অধিক চিন্তা ।

ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল, ‘কনেকে’ বিবাহ সম্ভার লইয়া যাইতে হইবে । তিন চারিজন আত্মীয় যুবক পীড়ি ধরিতে আসিলেন,— তাহাদের মধ্যে অতিমাত্র স্নেহের স্বরে, স্মিতমুখে কে বলিল, ‘কি চাক !’ চাক প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিয়া একমুখ হাসিয়া যেন লজ্জায় মুখ নামাইল । এমন মিঠে আওয়াজে, চেনা গলায় কে ডাকে ওই ? ইন্দু চাহিয়া দেখিল,—তাই ত, এ যে তারই প্রভাত ! চারি চক্রে মিলিল, নয়নে নয়নে হাসি উথলিয়া উঠিল ! ইন্দুর মনের মেঘ কাটিয়া গেল । এতক্ষণে ইন্দুর হৃদয়ে আনন্দের হিলোল দেখা দিল ।

এইবার ‘কনে’ ধরিবার পালা । চারিজন বাহ্যেক্ষেপ মধ্যে প্রভাতেরই কিছু বিপদ ! প্রভাত পীড়ি ধরিতে না ধরিতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কিল পড়িতে আরম্ভ হইল,—কোমলাঙ্গীদের হস্তের

কিলে কোমলত্ব থাকিবে, রসিকেরা এইরূপই আশা করেন, কিন্তু প্রভাত কিছু অরসিক, তিনি অবলা-বৃন্দের মুষ্টিযোগে তেমন রস উপভোগ করিতে পরিলেন না। প্রভাত শ্রীলাজের সুকোমল কর-পল্লবের মুষ্টি-ফল ভাদ্রমাসের তাল পতনের ত্রায় পৃষ্ঠে অনুভব করিয়া সহযোগী সঙ্গীকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “ভাই, তুমি যাহার কোমল সংস্পর্শে সুখ কি দুঃখ অনুভব করিতে পার না—একেবারে বিভোর হইয়া পড়,—

স এবায়ং তস্তাস্ত্বহিনকরকৌপমাসুভগো

মন্না লক্শঃ পাণিঃ ।

কিন্তু আমার ভাগে বিপরীত ফল। তোমার নিকট যাহা “মুহূনি কুসুমাদপি,” আমার কপালগুণে তাহাই ‘বজ্রাদপি কঠোরাণি।’

প্রভাত শ্রীলাজকেও এই মর্মে বিদ্রূপ করিতে ছাড়িলেন না। তার পর সাত পাক আরম্ভ হইল। প্রভাত চাকুর কাণে কাণে বলিলেন, “চাকুর, আমি আছি, তোমার দাদা আছেন, পাত্রও আছেন, এর মধ্যে সাতপাকের বাঁধাবাঁটি কার সঙ্গে হ’লে

ভাল হয় বল ত?" চাক্র অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া অতের অলক্ষ্যে প্রভাতবাবুর হাতে একটি সোহাগের চিঠি কাটিলেন, এটি কিছ কুসুমের মতই মুহু !

শুভদৃষ্টির সময় আসিল, চারিদিকে লাল আলো জলিয়া উঠিল—পুরাঙ্গনাগণ ছলুধ্বনি দিয়া উঠিলেন—পাত্র মন্থথবাবু সেই সময় একবার প্রাঙ্গণ হইতে ছলুধ্বনির উদ্দেশে উপরে দৃষ্টিনিষ্কপ করিলেন দেখিলেন, এক অলোকসানাত্মা যুবতী, সুন্দর বসন-ভূষণে বিভূষিত হইয়া রমণীমণ্ডলীর অগ্রে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন !

সেই হরিণাক্ষীর ত্রিধ্ব চঞ্চল অঁাখির সহিত মন্থথের অঁাখি মিলিল ! কি মনোমোহিনী মূর্তি ! মন্থথ আর একবার সে প্রতিমা দর্শনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, সহৃদয়-নয়নে লোলুপ-দৃষ্টিতে উপরে চাহিলেন ! নয়নে নয়নে মিলিতে না মিলিতে, সে স্থির সৌদামিনী-মূর্তি নয়ন নত করিয়া, ত্রস্তে পশ্চাতে রমণীমণ্ডলীর পশ্চাতে লুকাইল, চপলা যেন মেঘে মিশিয়া গেল ! চপলারই মত সেই

বিভাৎ-বরণা বামা চকল শ্রোভায় দর্শকের অঁখি মম
 বলসিয়া দিল! মমথ বড় অন্তমনস্ক হইয়া পড়ি-
 লেন। চাকর সতি শুভদৃষ্টিটাও যেন তেমন
 সুবিধানত হইল না।

ছাদশ পরিচ্ছেদ ।



“নাভ্ জামাই, জল খাও”—বাসরঘরে ঠাকুরাণীদিদির কণার উত্তরে: মন্থথ ‘খাই’ বলিয়া চঞ্চলদৃষ্টিতে একবার বাসরঘরে সমাগত বাসর-সুন্দরীদের শোভা দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, যেম, শরতের সুনীল আকাশে স্তারকারাঙ্ঘি উঠিয়াছে,—সরসীর স্ফুসলিলে শত শত কমলিনী ফুটিয়াছে! মন্থথের জল খাইতে বিলম্ব দেখিয়া কোন সুন্দরী বলিয়া উঠিলেন, “কনের মুখ দেখে কি নাভ্জামাই ক্ষিধে-তেকা সব ভুলে গেল নাকি?” উত্তরে মন্থথ কিছু বলিতে না বলিতে, আর এক সুন্দরী বলিলেন, “ক্ষিধে-তেকা ভুলতে যাবে কেন লো, নাভ্জানাই ভাব্চ—ভোগের আগে প্রসাদ পাই কেমন করে? চাকু তুই একটু প্রসাদ করে দে, নইলে নাভ্জামায়ের মুখে রুচবে না।” কথাটা শেব হইতে না হইতে আর একটি কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—“নাভ্জানাই আর জল খাবে কিলো—চাকুর

চাঁদপান্না মুখ দেখে সে নিজেই জল হয়ে গেছে।”
 পশ্চাৎ হইতে কোন কামিনী যেন একটু বিরক্তির
 সহিত বলিয়া উঠিলেন,—বড়ামাগীদের বাত্বিক
 দেখে বাঁচিনে, নাহ্জানাই জল হক্লেছে, সে ত
 ভাগই, তোদের বাবুবুদ্ধি হয়েছে, তোরা না হয় গোটা
 কত ডুব দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নে।” এইপ্রকার
 বাক্যবত্ণায় বাসরের আসর খুব জন্মিয়া উঠিল।
 কিন্তু মন্থথ তখনও নৌন অবলম্বনে। পাত্রে এই
 তুষ্কীভাব অবলোকনে, বাসরের চির-প্রথামত,
 জ্ঞানায়ের মুখ ফুটাইবার জন্য সুনন্দরীদের মধ্যে
 কেহ কেহ বগীদেবীর নিকট ফুটকড়াই মানিলেন।
 আর মন্থথকে ইতস্তত দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতে দেখিয়া
 ভাক্তার-গিন্নি, হাস্তমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাহ্-
 জানাই, পো-চোরের মত অমন ফাল্ফাল্ করে
 এদিক্ ওদিক্ দেখ্চ কি?” মন্থথের চক্ষু সতই
 একজলের সন্ধানে ফিরিতেছিল, সেটি অবশ্য “কনে”
 নহে, কেন না, কনে চাক্ আপাদমস্তক লাল
 চেলিতে আবৃত হইয়া শুধু মুখখানি বাহির করিয়া
 পাত্রে বানদেশে কলাবোটির মত বসিয়াছিল,

“সমবয়সীর দল” মাঝে মাঝে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিতেছিল, আর হাসিঝা কুটিকুটি হইতেছিল, চারুও অবশ্য তাহাতে যোগ দিতেছিল। বিবাহের রাত্রে বালিকা ‘কনে’ লজ্জার ধার বড় ধারে না। মন্মথের চক্ষু যখন অভিসারে ধরা পড়িয়া গেল, তখন মন্মথ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু এই অবলা-সমিতির নিকট প্রবলপ্রতাপাশ্রিত পুরুষব শাবত স মন্মথ একেবারে বোকা বনিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই ডাক্তারগিরির পান্টা গাহিলেন ; বলিলেন, “এখানে ব্যবসায়ের কোন সুযোগ হয় কি না, তাই দেখিতে-ছিলান।” ডাক্তারগিরি বিদ্রূপটা গায়ে মাখিলেন না, কথাটা ফিরাইয়া দিলেন ; বলিলেন, “ভাই, তোমার মুখ-পোড়ানই সার হ’লো, সীতাউদ্ধার হ’লো না, মিছে তোমার কষ্ট ক’রে আসা, এখানে সে ব্যবসায়ের কেউ নেউ, তুমি এখন পথ দেখ।” এইরূপে কথা-কাটাকাটি বাধিয়া গেল। বাসরের খোলা বড় তপ্ত হইয়া উঠিল, মন্মথের মুখে খই ফুটিতে লাগিল, দু’টা একটা তপ্ত ছিটে স্নানঘর-

জগের গায়েও পড়িল। সুন্দরীগণ এতক্ষণে বুঝিলেন, ফুটকলাই মানাটা বাজে খরচ হইয়াছে। এইখানে বলিয়া রাখি, বাসরের এই ঠাকুরাণী দিদিরা সকলেই কিছু আসল 'ঠান্দি' নন। ইহার মধ্যে নকলও আছেন; আবার তার সংখ্যা ছুটি একটি নয়, নকলই বরং অধিক। অনেক স্বপ্নসম্পর্কীরা ঠাকুরাণীও কেহ বা বৈষ্ণব বৌ কেহ বামুণদিদি, কেহ সরকারগিরি নামে ছদ্মবেশে ঠাকুরাণী দিদির দলে মিশিয়াছেন। বিস্তারিত পরিচয় দিব কি? পাঠক! মহাশয়রা কি বলেন? না—আর অপ্রতিভ করিয়া কাজ নাই। তবে ভবিষ্যতের জ্ঞান সাবধান হইলেই হইল।

ইন্দু এতক্ষণ পশ্চাতে ডাক্তারগিরি প্রভৃতি "মহা-
স্বপ্নবৃন্দে" অন্তরালে বসিয়া, ঠাকুরাণী দিদিদের
"কবির লড়াই" শুনিতেছিল। ডাক্তারগিরি কিন্তু
এতক্ষণের পর তাঁহাকে আসরে নামিবার জন্ত "ছটে-
পটে" ধরিয়া বসিলেন। ইন্দু কিন্তু ঠাকুরাণী দিদির
কথা রাখিতে পারিল না। বাসরে, বিশেষত এত
শুষ্ক লোকের সম্মুখে বাচালতা প্রকাশ করা ইন্দুর

কাজ নয়। বিশেষ ছদ্মবেশী অনেক গুরুজন
সেখানে বসিয়া আছেন। ডাক্তারগিরি তবু ছাড়েন
না—“ইন্দু, তে'র হ'লো ভগিনীপতি—বোনাই।
তা আবার যে-সে বোনাই নয় লো সোদর বোনাই,
তুই কি না আছিস চুপ্চাপ্! তা হ'লে আমাদের
কি গরজ, আমরাই বা কেন বাসর জাগি, আখ
মুখ বাথা করে মরি। একেই বলে 'যার বিয়ে
ভার মনে নেই, পাড়াগড়শির ঘুম নেই।’” ইন্দু
বুঝি ডাক্তারগিরির কাণে কাণে কি বলিতে
বাইতেছিল, এমন সময়ে ঠাকুরাশীদিদির দলের
কে একজন বলিয়া উঠিলেন, “হঠে তোমাতে
আর নাতুজানায়ো পান্টা-পান্টি, যার নাম যাতে
বাড়ে বুদ্ধ, এর মধ্যে গিয়ে ইন্দু কি ক'রবে বল?”
বাসর গৃহে আর একটা হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল।
ইন্দুর মধুর অধরেও মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল
সেই বৃহৎ হাশ্বে ইন্দুর প্রকুল-মুখকমলের উপর
যেন জ্যোৎস্না খেলিয়া গেল। বিস্মিত বন্থ
দেখিলেন, এই সেই মূর্তি! শুভ দৃষ্টির সময়ে
এই স্বর্ণ-প্রতিমার বিকীর্ণ জ্যোতিই বন্থের হৃদয়

উল্লিখিত করিয়া দিয়াছিল। আর এতক্ষণ ইহারই
 আশ্রয়ে মন্মথের চক্ষু চক্ষু ইতস্ততঃ হতেছিল।
 ওই যে মধুমাসের পুর্ণিমা রাত, ওই যে বৈশাখের
 মুকুতিত আশ্রমশাখা, ওই যে হেমন্তের কাঙ্ক্ষিত
 রাকার তার অথবা ততোবিক মনোহর রূপ-
 মাধুরী, সে কি ইন্দুর? যে রূপ মেহে ধরে
 না, তাদের ভরা গদ্য মত যে রূপ উছলি
 উছলি পাড়িতেছে, সে রূপের আশ্রয়ার্থী কি
 তবে মন্মথের ঠাকুর-ঝি ইন্দু! হায় এহ ইন্দুর
 সাহতই মন্মথের বিবাহের কথা হইয়াছিল। মন্মথ
 তখন কেমন সে বিবাহে সন্মত হয় নাই! চাক
 হুদরী বটে, কিন্তু ইন্দুর কাছে কি? পুর্ণিমার
 পূর্ণ-শশীরের মাধুরী-মুগ্ধ নয়নে কি দ্বিতীয়ার
 ক্ষীণচক্রে ম্লান শোভা ধরে? চাক যে শুধু
 কুসুম-কলিকা, সে রূপ ফুটে ফুটে ফুটে না, আর
 ইন্দু যেন বসোরার প্রকৃতি গোলাপ! রূপ-
 মন-সঙ্গে মন্মথের মস্ত-মন-ভঙ্গ তাহা হইতে উঠে উঠে
 উঠে না।

মন্মথ ভাবিতেছেন, কেন আমি “ভাঙিহু মঙ্গল

ষট্টি নিজ পদাঘাতে !” এদিকে ডাক্তারগিন্নি কত বলিয়াই চালাইয়াছেন — “ইন্দু তোর কি আজ চুপ করে পাকা ভাল দেখায় না ? আজ যে তোর পাথরে পাঁচ কল খোঁসায় এক লখি । তোর যে আজ পতিতে পতিত ধূলপরিমাণ ।” ইন্দু সেই বলিয়া উঠিল, “দেখনহাসির ও আবার কি কথা ! পতির ধূলপরিমাণ কি গো ?” ডাক্তারগিন্নি বলিলেন, “কেন, এক নম্বর নিজের পাত, দুয়ের নম্বর ভগিনীপাত, জানিস্হ ত, “ভগিনীপতি হ’লো হ’লো নরপতি । ডাক্তার-গিন্নির বাড়াবাড়ি দেখিয়া জীড়াবনত মুখে ইন্দু বাসরগৃহ ত্যাগ করিল, তার সেইও সঙ্গে সঙ্গে উঠল কিঞ্চিৎ বাইবার সময় ডাক্তার-গিন্নিকে এক খোঁচা দিয়া গেল ; বলিল, “দেখন-হাসিদের বুঝি ঐ নিয়ম ।”

ইন্দুর শাপে বর হইল । কত দিনের পর, আজ স্বামী আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য এতক্ষণ ইন্দুর ননটা আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল — “চঞ্চল চরণ ছুটি, যেন যেতে চায় ছুটি,” কিঞ্চিৎ লজ্জা আসিয়া বাবা দিতেছিল—পাছে

কহ বিদ্রল করে। এখন ইন্দু বড় ফাকি দিয়া পালাইল, শাপে বর হইল।

* * * *

আহারের জন্ত মন্মথের ডাক পড়িল। আহার করিতে করিতে মন্মথ অত্ৰ অত্ৰ কথা-পেসঙ্গে ইন্দুর কথা তুলিয়া বালা-বঙ্গু প্রভাতকে বলিলেন,—
“ভাই, তোমারিই জিত।” প্রভাত সহাস্তে উত্তর দিলেন,—“কেন? আর আমার চেয়ে তোমারই বা হার হ'লো কিসে?” মন্মথ—“এই ধানে, আর তুখে।”

* * * *

“ছি। ও আবার কি কথা,” প্রভাতের আলিঙ্গনাবদ্ধা ইন্দু জীবৎ কোপকুটিল-কটাক্ষে ঠাহর কি একটা কথার উত্তরে বলিল “ছি! ও আবার কি কথা, ও সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না কিহু।” “ঠাট্টা নয় ইন্দু, সতাই তোমার রূপ মন্মথের চক্ষে বড় ধরেছে। সে তাই আমাকে বলছিল,—তবে শেষ কথাটা আমার বলা বটে।” বলিয়া প্রভাত ইন্দুর মুখচুষন করিলেন। উত্তরত

আলিঙ্গন কিছু গাঢ় হইল । কিন্তু সহসা যেন
কোথা হইতে দম্পতির শাদা মনে একটা বিবাদের
কণিক ছায়া পড়িল ।

• • • • •

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।



মন্মথ বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে শশুর-
বাড়ী আসিয়াছেন । কিন্তু চারু আজও ছেলে-
নাম্বুষ । তাকে ‘ধরে বেধে’ মন্মথের ঘরে দিয়া
আসিতে হয় । মন্মথ চারুকে কথা কহাইবার
জগ্ন কত চেষ্টা করেন, চারু কিন্তু কলাবৌটির মত
একহাত ঘোমটা টেনে, ‘গুটিমুটি’ হ’য়ে, বিছানার
এক পাশে জড়ের মত পড়ে থাকে । মন্মথ কত
ডাকে, কত সাধে, কত অভিমান করে, কখন
রাগও করে, কিন্তু চারু ফিরে চায় না । কত
হা’হতাশ কত দীর্ঘশ্বাস, নিষ্ঠুর চারু তবু কথা কয়
না । চারুর মা ও খুড়ি, দুইএকদিন ‘আড়ি’
পাতিয়া, জামাই বেচারার এই দুর্দশা দেখিলেন ।
চারুর এই ব্যবহারে জামাই পাছে সতাই বিরক্ত
হন, মা ও খুড়ির এই এক আশঙ্কা জন্মিল ; তাই
চারুকে কোনরূপে ‘আগান’ দিয়া, ‘হাতারাতি’

স্বভীষাণ করিবার জন্য তাঁহাদের বিশেষ চেষ্টা
পড়িয়া গেল। চারুকে তাঁরা কখনও বাকিতেন,
কখনও ডয়, কখনও বা লোভ দেখাইতেন। কিন্তু
কেমন ‘একশুঁয়ে’ মেয়ে চারু, সেসব কথা সে
কাণেই তুলিত না! এমত চারুকে এক আশ
দিন মার কাছে একটু বেশীকম দাঙ্কিত হইতে
হর; কিন্তু সব চারু বাগ মানিল না। কিছুতেই
কিছু হইল না দেখিয়া, মা ও খুড়ি হারি মানি-
লেন। চতুর্থদে চারুর দিদি ইন্দু খন্ডরবাটী হইতে
আসিল। ইন্দু আসিলে তার মা ও খুড়ি কঁক
ছাড়িয়া বাঁচিলেন; ইন্দুকে বলিলেন, ‘আমরা ত
চারুকে ‘দাঁটে উঠতে’ পারেন না, এখন বাছা
কুই বা পারিস্ কর! চারু ত তোমার কথা শোনে,
কুই কেন রাতে তাকে সঙ্গে করে বস্ত্রখের ঘরে
নিরে বাদ্লে?’ ইত্যাদি।

পিতা মানসিংহ কড়ক সেনাপতি-পদে অভি-
ষিক্ত জগৎসিংহ যেমন উল্লাসে, গর্বে, স্বীয় রূপ-
পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য আশপাশে সচেষ্ট হইয়া-
হিসেন, ইন্দুও তেমনই এই ব্যাপারে ক্রটি

দেখাইতে আপনার সমস্ত কোশল, সমস্ত প্রয়াস
নিরোপিত করিল।

ইন্দু এখন প্রতিবাত্তে চাকর মন্মথের ঘরে
দিয়া আসে, তানাক্রপ অধ্যবসায় চাকর মুখ
কুটাইতে ও লজ্জা জড়িত হইতে পারে। মন্মথ
একদিন তাস খেলিবামতঃ চলিল; ইন্দু দেখিল
পরামর্শটা মন্দ নয় এই উপায় মন্মথের সচিত্র
চাকর ভাবটা সহজ হইতে পারিবে; কেন না,
সে জর্জরিত চাকর তেমনি মন্মথের নাক না লাগুক,
খেলিতে কিছু তার ক্ষতি নাই। তাহ'লে
কি হয়, চাকর সহজ মন্মথের সঙ্গে খেলিতে
'রাজি' হইল না। “বরের সঙ্গে আবার খেলি” ছ!
নিম্নের বৈমল কাচ!” কিন্তু দিদি যে কিছুতেই
ছাড়ে না, একে দিদির বকুনি, তাতে মাঝের অপ-
মানের ভয় চাকর কি মুকিলেই পড়েছে গা! চাকর
মনে মনে মা হুর্গা, কালী, কত দেবতাকেই মানে,
“কবে ও আমাদের বাড়ী থেকে যাবে,” কিন্তু
কেমন নিষ্ঠুর দেবতা, তার মিনতি কেহ শুনে না।
প্রথম আর কি করে, দুইএকদিন দেখিয়া, চাকর

অগত্যা খেলিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু ঘোমটা
কিছুতেই কমাইল না। দিদি চলিয়া গেলে, চারু
আর খেলা হইত না, কাজেই ইহাকে বসিয়া
থাকিতে হইত। বাজী শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সব দিন
চারু বৈর্যা থাকিত না! সে খেলিতে খেলিতে
প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িত। মন্থের অনুরোধে ইহা
সে বাজীটা শেষ না করিয়া বাইতে পারিত না।
রাত্রির এই বন্দোবস্তে কিছু ইহুর উদ্দেশ্য সকল
হইল না, চারুর মূখ দুটিল না। দিদি চলিয়া
গেলেই আবার যে চারু সেই চারু! 'বন্দোবস্ত
চারু মধ্যে প্রায়ই সন্ধ্যা ৬০০০ না হইতে ঘুমাইয়া
পড়িত। কাজেই দিনমানেও চারুকে মন্থের
ঘরে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইল। চারু
অনেক কারাকটি আগন্তি করিল, কিন্তু কে তার
কথা শুনে বল? শেষ ছাপুর বেলাতেও চারুকে
দিদির সঙ্গে ঘরে আসিতে হইত, কিন্তু সে দিদির
আঁচল ছাড়িত না। দিদিকে মাঝে রাখিয়াই
কোনদিন দেখা বিস্তি, কোনদিন বা 'গোলাম-
চোর' খেলা হইত। বিস্তিখেলার, মন্থ ইচ্ছা

করিয়া মাঝে মাঝে খেলার নিয়ম ভাঙিত; চাণুর সেটা অসহ্য হইত, সে নিজে মুখ ফুটিয়া মন্থণকে কিছু বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু দ্বিধিক তখনই কাণে কাণে বলিত—“ও কি! অমন কেন?” আবার গোলাম চোরে, মন্থণ জায়ই সাধ করিয়া “গোলাম-চোর” হইত। চাণুর তাতে ভারি আনন্দ, ভারি উৎসাহ। সে সময় চাণুর অজ্ঞাতে ভাণ্ডার ঘোণ্টী একটি সরিয়া যাইত, কোনদিন হয় ত সেই মুহূর্ত্তে মন্থণের সহিত, তার “চোকোচোকি” হইয়া যাইত, মন্থণের চক্ষে হাসি ফুটিয়া উঠিত। সে হাসি বেন “তেরে গিয়ে হোসে চাণুর” চাক করিয়া তাহাতে বড় আনন্দিত হইত, গোলাম মুখ নামাশত। অঙ্গুলিপার্শ্ব লক্ষ্যবর্তী গন্তব্যে যখন ‘জটিজটি’ হইয়া যায়, চাক তেমনই জটসদ হইয়া পড়িত কোনদিন বা পলাইয়া যাইত বেগী পীড়পীড়ি ডাল নয় বলিয়া ইন্দুও তাহাতে আর আপত্তি করিত না। চাক চলিয়া আসিলেও ইন্দু মন্থণের সহিত গল্প করিত। তবে জায়ই ইন্দুর ছইএকজন ‘সমবয়সী’ বা ছইএকজন ঠাকরণ

দ্বিদি সে সময়ে আসিয়া জুটতেম ; নানা রকমের
কথাবাড়া, হাসি-তামাসা চলিত । মন্থ বেষ মিষ্টি
মিষ্টি মজার মজার গল্প করিতে পারিত : সে গল্প
শুনিতে ইন্দুর বড় ভাল লাগিত । ক্রমে মন্থের
সহিত তাসখেলা ও গল্প করা ইন্দুর একটা নেশা
হইয়া দাঁড়াইল ! মন্থ যদি আহারান্তে দৈবাৎ
বাহিরে বাইত, ইন্দু অমনি মন্থকে ডাকাটতে
পাঠাইত । আসিতে বিলম্ব হইলে অভ্যয়
করিত । মন্থ শীঘ্রই ইহা বুঝিল : নাহয় কি
জানি কেন, ইচ্ছা করিয়া মাঝে মাঝে আসতে
বিলম্ব করিত । শেষ আবার সাধিয়া তাঁকরায়ের
অভিমান ভাঙাইত ! কে জানে, এ বেশ খেলিয়া
কি লাভ ? সতলা ইন্দু অতশত ব্যস্ত না, সে
অকপটে মন্থকে বিশ্বাস করিত ; মন্থ যেন
তার ‘সমবয়সী’ । এইরূপে আমোদে-আহ্লাদে,
হাসি গল্পে দিন কাটিতে লাগিল । ক্রমে
মন্থের প্রতি ইন্দুর মেহ ও বন্ধুত্ব পাচ হইতে
গাঢ়তর হইল । ইন্দু চারকে এরিয়া দিবার
অল্প আয় বিতায় করিয়াছিল, এখন উর্ণনাথের

ସତ୍ତ୍ୱ ସେ ଜାଲେ ଅଜ୍ଞାତେ ଆମାନହି ଜଡ଼ିତ ହଉଛେ
ଲାଗିଲ !



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।



“কলিকাতা” * * নং বেচু চাট্‌গোয় লেন ।

২২শে মার্চ, ১৩০১।

“ইন্দু !

“কতদিন তোমার চিঠিপত্র পাইতেছি না কেন ? ভাল আছ ত ? বাড়ী হইতে প্রসন্নপুর বাইবার পূর্বে লিখিয়াছিলে, ‘সেখানে গিয়া খুব ঘনঘন পত্র দিব ’ কিন্তু এ দুইসপ্তাহের মধ্যে, কেবলমাত্র একখানি চিঠি দিয়াছ, এরই নাম, যে বা রোগী ছিল বসে, বৈদ্যে শোয়ালে এসে ।’

“তোমার পত্র পাইতে বিলম্ব হইলে যে কত অদীর হই, তা ত তুমি জান ? জানিয়াও যে ইচ্ছা করিয়া বিলম্ব করিবে, এ বিশ্বাস ত হয় না ! তাই এত ভাবনা ।

“ওনিলাম, আশাইবলিতে যন্ত্রণা ত্যাগ তোমার ওখানে আসিয়াছেন । চাককে ‘ত কতদিন

দেখি নাই সে কত বড়টি হয়েছে ? বন্ধুত্বের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা কর ত ?

“ইন্দু, চার-বছর আগে, তুমিও এখন তোমার বোনটীর মত ছিলে। সে দিন মনে পড়ে ! ক ? সে সব কথা মনে হ’লে বোধ হয় এখন তুমি খুব লজ্জিত হ’বে, কিন্তু আমার পক্ষে এখন সে স্মৃতি বড়ই মধুর ! তা’ বলে আবার তোমাকে পাক-গুটি কাঁচর বস্ত্রে বলিয়ে, কেন না, সে দিন আর কিরবে না নাগট সে সব স্মৃতি এত মধুর মনে হয়। আবার ভেদমান করে, তোমার ভালবাসার পাঠশালে হাতে ধাঁড়ি দিয়ে, অক্ষরপরিচয় করিয়ে দাবে যে আশাচর্চা যদি থাকত, তবে হয় ত তুমি নামেও চমকে উঠ’ত। কিন্তু সে ভর জব নেই, এখন ত তোমার ‘গুহমারা বিদ্যা’।

• “তা সে কথা থাক। আজকাল বোধ হয় তোমরা খুব আমোদে আছ ? তা বেশ। কিন্তু দেখো, যেন নূতন আমোদ পেয়ে, পুরোনোদের একেবারে ভুলো না। শায়ের বিবিট যেন মনে থাকে,—‘সেবকায় পুরাতনঃ’।

“এখন, তোমাং থাক। সত্য ই তোমার পত্নের
জন্ম পথ চোর আছি। কেমন আচ্ছ? আমি
অমনই বেঁচে আছি। এখন বিদায়। ইতি—

“তোমারই প্রভাত।”

চিঠিখানি দে ইন্দু স্বামীর, তা আর আনাদের
পাঠক-পাঠিকাদের বলিতে হইবে না।

ইন্দু পত্রখান পড়িয়া কি ভাবিতে ভাবিতে
উপরের ঘর বাইতৌড়ল। চিঠিখানি তখনও
হাতে। সে সন্ধ্যা নক্ষত্র। নাচে নাগিতোছিল,
সিঁড়ির ধরে উভয়ের দেখা হইল। নক্ষত্র হাসিতে
হাসিতে ভিত্তিলা কবল, ও তার চিঠি ঠাকুর্বাণি?”
“কই, কখন?” বলিয়া একটু হাসিয়া ইন্দু চিঠি-
খানি হাতের মুঠায় লুকাইল। নক্ষত্রের প্রথমে সে
সন্দেহটুকু ছিল, এখন তাহা দূর হইল। সে
আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, “চিঠি দেখাবে
বলেছিলে যে, দেখাও।” ইন্দু “না না, সে চিঠি
নয়,” বলিয়া পাশ কাটাতেছিল, নক্ষত্র পথ
আটকাইল, বলিল, “চিঠি দেখাও, নইলে কিছু
ছাড়ব না।” ইন্দু চিঠির খানিকটা বাহির করিয়া

হাত দূরে রাখিয়া বলিল, “এই দেখ।” মন্থথ
 ক্ষিপ্রেহস্তে চিঠীখানি গইতে গেল, ইন্দু সেই অব-
 কাশে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিল
 না, মগধ তার হাত ধরিল! সহসা ইন্দুর হাসি-
 ভাস্মাসা সব বন্ধ হইয়া গেল। সে প্রকুল মুখখানি
 পশ্চীর হইয়া উঠিল, পূর্ব বিরক্তির ও দৃঢ়তার সহিত
 ইন্দু বলিয়া ফেলিল, “ও কি মন্থথ, হাত ছাড়।”
 মগধ অপ্রতিভ হইয়া, ভাড়াভাড়ি হাত ছাড়িয়া
 বাহিরে চলিয়া গেল।

মন্থথ ইন্দুকে হান্তময়ী চপলপ্রকৃতিই জানিত,
 বুঝি তাই এতটা সাহস করিয়াছিল; আজ, সেই
 চপলার ক্ষণিক প্রভাবে, সে একেবারে স্তম্ভিত
 হইল।

—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।



মন্মথ যখন বাহিরের ঘরে একাকী থাকিত, তখন ছোট ছোট বালক বালিকার দল বড় নজা পাইয়া যাইত। কেহ একটা বটেব পাতার কতকগুলি ধূলি, ছু'খানা খোলামুকুটি, হ'লো বা গোটা-কতক তেলাকুচা আনিয়া বলিত, “মন্মথবাবু খাও।” কেহ বলিত, “টুমি নাকি চারু ডিডির নাম করেছ ? ওহো ! বোঁএর নাম করেছ, সবাইকে বলে ডেব। কেহ বা মন্মথের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিত, “টোমাকে চারু ডিডি ডাক্চে।” মন্মথ ইহাদিগকে একআধবার যে ত্যাড়াভুড়ি না দিত তা নয়; কিন্তু আসলে সে বিরক্ত হইত না; বরং মাঝে মাঝে সেই ছেলেখেলার বোগ দিত। মধুর রসের সধক না হইলে বুঝ এতটা মধুর ভাবের প্রবাহ বর না।

এই সব বালক-বালিকার পশ্চাতে আর এক হল বালিকা থাকিত। তাহারা বাহিরে আসিবার

পাথে সদব দরজা। ভেজাইয়া, তাহার ফাঁকে দাঁড়া-
ইয়া দাঁড়াইয়া, উঁকি দিয়া সব দেখিত। আর
মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়া, সেই ছোট দলকে
ডাকিয়া, নূতন নূতন তানাসা শিখাইয়া দিত!
নন্মথের সহিত চোখোচোখি হইলেনই “ওলো
দেখেছে লো” বলিয়া ঝন্ডান্ রবে সেই বালিকার
দল অন্তরের দিকে ছুটিয়া যাইত। আবার, টিপি
টিপি আসিত, হাসিত, পলাইত। ইহারা চাকর
অনেকটা সমবয়সী। নন্মথ অগ্রদিন এ সব বেশ
উপভোগ করিত। আজ ইহারা অনেকগুলি ছুটা-
ছুটি, লাফালাফি করিল, কিন্তু নন্মথ সে-দিকে বড়
মনোযোগ দিল না। তখন সেই “গৃহ-হারা
আনন্দের দল” যেমন একটু ক্ষুধা হইয়া চলিয়া গেল।
নন্মথ অগ্রমনস্কভাবে একখানি হাঁজ চেয়ারে শুইয়া
ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ঘুম আসিল
না, মনটা বড় চঞ্চল। মুড়ুমুড়ুমু নন্মথ, কি
একটা ভাবিতে ছিল, এমন সময় শুনিল,—

“ঘুমুলে ঘুমুলে পান খেলে না,

পান সেজেছি এত চন্দনা ;

ছোট বলে কি মনে ধরে না,

ছোট কি কখন বড় হবে না!”

মন্মথ হাসিয়া চক্ষু মৌলল। দেখিল, সম্মুখে
একটি কৃত্রিম পান হাতে দাড়াইয়া তাহার অমন-
বর্ষায়া শ্রুতিকা হেম। মন্মথ তাকে দেখি তাত
বাড়াইয়া ধরিতে গেল, সে অর্মান পানটি মন্মথের
গারে ছুড়িয়া হাসিতে হাসিতে একদোড়ে পলাইয়া
গেল। এমন সময় কে ডাকিল, “জানাইবাবু!
‘দিদিমণি’ আপনাকে ডাক্চে।” সে ডাক বাণী-
ধ্বনির মত মন্মথের কাণে বাজিল। মন্মথ তখন
কাঁচপোকায় অকুণ্ট আরম্ভলার মত ঝির অত্মসম্মুগ
করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।



মধ্যাহ্নের সেই ঘটনার পর মন্থথ বাহিরে চলিয়া গেলে, ইন্দু মনে মনে বড় অপ্রতিভ হইল। আজ সহসা কোথা হইতে তার এতটা দৃঢ়তা আসিল। সে নিজেই একটু বিস্মিত হইল। ভাবিল, কাজটা ভাল হয় নাই। ভগিনীপতি হাত ধরেছিল, তা সেটা আর এমন দোষের কি হয়েছে? সবারই ভগিনীপতি এমন ধরে! তখন আর কোন কথা ইন্দুর হৃদয়ে ঠাই পাইল না, শুধু মনে হইল, তার এই ব্যবহারে না জানি মন্থথ কত কষ্টই পেয়েছে! ছি! ইন্দু অপ্রতিভ হইয়া আপন মনে জিভ কাটিল।

সেদিন বৈকালে অন্তদিনের চেয়ে 'সকাল সকাল' মন্থথের জলখাবারের ডাক পড়িল। অন্তদিন মন্থথের শাণ্ডী তাকে জলখাবার দেন, আজ ইন্দু জলখাবার দিতেছে। ইন্দু জলখাবার দিল বটে কিন্তু মুখ তুলিয়া মন্থথের দিকে চাহিতে পারিল না! নতমুখে বলিল, "মন্থথ জল খাও।" মন্থথ

প্রথম ভাবিয়াছিল, বুঝি আজ জলখাবারে কিছু ‘ভেল’ আছে, কিন্তু মধ্যাহ্নের ঘটনায় সে সন্দেহ তার মনে আর স্থান পাইল না। সে ইদুর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল, তখনও ইন্দু অবনতমুখী, মন্থ মুণ্ডনেজে দেখিল, সেই অপ্রতিভ-অপ্রতিভ মুখে আজ এক অপূর্ণ শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। মন্থ ব্যাপার বুঝিল, মনে মনে হাসিয়া ডাকিল, ঠাকুর-ঝি !” ইন্দু মুখ তুলিল, চারিচক্ষে মিলিবামাত্র উত্তরেই হাসিয়া ফেলিল। লজ্জার বাধ ভাঙিয়া গেল। সেখানে আর কেহ নাই দেখিয়া, মন্থ সপ্রতিভভাবে বলিল, “কই—চিঠি !” চিঠি ইন্দুর আঁচলে বাঁধা ছিল, একটু হাসিয়া চিঠিখানি খুলিয়া ইন্দু মন্থের হাতে দিল। মন্থ পত্রখানা আগাগোড়া পড়িল, পড়িয়া একটু হাসিয়া, ফিরাইয়া দিল।

* * * *

মন্থ কাল বাড়ী যাইবে, আজ রায়েই তাই পেলার ধুমটা একটু বেগী। “অনেক রাত হয়েছে, এখন যাই” বলিয়া ইন্দু একবার উত্তে চাহিতেছিল, কিন্তু মন্থ বাধা দিল; বলিল, “রাত আর কই

হারাচ্ছে, আর আজকের রাত বই ত নয়।” ইন্দু ভাবিল, তা বটে। সরলা বালিকা আবার খেলিতে বসিল। চাকর তখন অন্ধক রাত্রি।

ঝন্ ঝন্ ঝন্ -- বাতীরে মৃদলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। জগজগৎ ভবভব গভীর গর্জনে মেঘ গান্ধিতেছে। সেই ‘ঘন ঘোর বাদল’ নিশীথে, ইন্দু আর মন্থ খেদিত্তেছিল, গল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, আর ইন্দু মনে মনে মন্থখের রসিকতার প্রশংসা করিতেছিল। রাত্রি গভীর, সন্সার স্তব্ধ, কেবল মন্থ আর ইন্দু খেলায়, গল্পে, হাসিতে বিভোর! সেই বিভোর অবস্থায় খেলিতে খেলিতে কি একটা কারণে তাস লইয়া উভয়ের মতদৈব ঘটিল। ক্রমে তাস লইয়া টানাটানি, কাড়াকাড়ি, হাসাহাসি আরম্ভ হইল। সহসা গৃহনবো প্রচণ্ডবেগে একটি ‘দম্কা’ বাতাস প্রবেশ করিল। প্রদীপ নিবিয়া গেল!

ধীরে, অতি ধীরে, ইন্দু সে কক্ষ ত্যাগ করিল। উদ্বেলিতকণ্ঠে মন্থ ডাকিল, ‘ঠাকুর ঝি!’ ইন্দু

ফিরিল না । বুঝি সে কথা তার কাণে গেল না ।

*

*

*

*

মন্থ পরদিন অতি প্রকাষে বাতী চলিয়া গেল
চাক আবার হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে
লাগিল । কয়েদী ঘেনন ছেলখানা হইতে নিকৃতি
পাওয়া মুক্ত বাতাসে আপনাকে স্বচ্ছন্দ মনে করে
সে তেমনি হাঁক ছাড়িয়া দাঁ চন । ইন্দু কিন্তু বড়
বিমর্ষ । এই বিষঃভাব দেখিয়া ডাক্তার গিল্লি,
ইন্দুর মুখের কাছে, হাত নাড়িয়া সুর করিয়া
বলিলেন,—

“সোণার নাতিনৌ, এমন যে কেনি

হইলি বাড়ির পারা,

সদাই রোদন, বিরস বদন,

না বুঝি কেনন পারা ।

যমুনা যাইতে, কদম্ব তলাতে,

দেখিলি যে কোন জনে ?

যুবতী-জনের ধরম-নাশক

বসি থাকে সেইখানে ।

সে জন পড়ে তোর মনে ।

সতীর কুলের, কলঙ্ক রাখিলি

চাহিয়া তাহার পানে ।”

ইন্দুর সমবয়স্কারাও বিক্রপ করিতে ছাড়িল না। কেহ বলিত, “নে ভাই ইন্দু, তোরা আর বাড়াবাড়ি দেখে বাঁচিলে। ভগিনীপতি তো সবারই আছে লো!” কেহ বা স্থর আর একটু চড়াইল, “কি লো, মন্থ গিরে তুই যে একেবারে ব'য়ে গেলি। লোকের বয় বিদেশে গেলেও ত এমন হয় না।”

ইন্দুর মাও ক্রমে ইন্দুর এ পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন, “ইন্দু! তোরা হলো কি? দিনরাত অমন করে কি ভাবিন্ বস্তুতো, দিনকের দিন যে শুকিয়ে উঠলি।”

ইন্দু. কোন উত্তর দিত না। শুধু নতমুখে, কান্দকান্দ হইয়া থাকিত। কোন দিন বা অস্ত্রের অলঙ্কে; কাঁধিয়া ফেলিত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।



আজ অনেক দিনের পর প্রভাত ইন্দুর হস্তাকর
পাইলেন, সাগ্রহে তাড়াতাড়ি পত্র খুলিলেন—

“প্রিয়তম !

সতাই এ পোড়ারমুখী তোমায় ভুলিয়াছিল,
বহিলে এমন গুরুতর পাপ করিবে কেন ! আমার
অপরাধের ক্ষমা নাই ! তোমাকে অনেক কথা
লিখিব বলিয়া এ পত্র লিখিতে বসিয়াছিলাম, কিন্তু
আজ আর তা’ পারিলাম না । সকল কথা পরে
লিখিব, কেমন আছ ? ইতি—

“পাপিষ্ঠা

ইন্দু”

“একি এ ! একি আমার ইন্দুর পত্র ! ইঁ
ইন্দুর হস্তাকরই ত বটে ।” প্রভাত একবার দুইবার
তিনবার কতবার পত্র পড়িলেন, কিছুই ঠিক করিতে
পারিলেন না । প্রভাতের মনে কত রকমের অশু-

মান উঠিতে লাগিল, শেষ পত্র বন্ধ করিয়া প্রভাত
 ভাবিলেন, “ছি ! আমি কি পাগল ! কিহু—কিহু
 ইন এমন করিয়া পত্র লিখিল কেন ?” আবার
 ঐ কথা ! শেষ প্রভাত সিদ্ধান্ত করিলেন, আগোদে
 মত হইয়া আমার পত্র দিতে বিলম্ব করিয়াছে
 বলিয়া ইদু নিজেই বড় অপ্রতিভ হইয়াছে । তাই
 অনুতাপ করিয়া এমনতর লিখিাছে । এ সামান্য
 কথাটাও এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই ! আমি কি
 নিমোষ ! প্রভাত ফেরত ডাকে উত্তর দিলেন—

“আমার ইন্দু !

“পত্র দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তা এত লজ্জা
 কি ? আর এই সামান্য কারণে এমন অপরাধীর
 মত পত্র দিয়াছ কেন ? এ ত অতি তুচ্ছ কথা,
 যদি প্রকৃতই তুমি না বুঝিয়া কোন গুরুতর অপরাধ
 করিয়া এমনই করিয়া অনুতপ্ত হইয়া, আমার
 জানাও, আমি তোমার সে প্রথম অপরাধও মার্জনা
 করিতে প্রস্তুত । যা হোক এর জন্য এত অপ্রতিভ
 হবার কারণ নাই । তুমি আমার ভুলিতে পার

না, তা আমি বেশ জানি। কিন্তু এমন করে পত্র দিতে আর দেবী করো না! লগ্নী আনার !

“অন্য অন্য কথার উত্তর দাও নাই কেন ?

“চাকরদের কেনন ভাব হলো জানিতে উৎসুক আছি। স্বনাথ এখন কোথায় ?

“কেমন আছ। আমি ছুটির চেয়েই আছি। ছুটি পোলট তোমায় আনিতে যাইব। আর যদি এব মনো অল্প সুযোগ পাই, তবে ততদিনে অপেক্ষা করিতে হবে না। এ সুখবরের জন্য কি খেতে দেবে দাও। ইতি ”

ইদু স্বনাথসম্মুখে এ পত্রের উত্তর দিল —

“তুমি আমার অপরাধ যত সামান্য মনে করিতেছ, আসলে তা নয়। পাপিষ্ঠা আমি, তোমার নিকট অবিধাসিনী হইয়াছি, আমার লইয়া তুমি কি আর সুখী হইতে পারিবে ? একদিন বিভারিত জানাইব। আজ থাক।”

পত্র পড়িয়া প্রভাতের মাথা ঘুরিয়া গেল। নিচ্ছে কথা এ, ইদু পাপিষ্ঠা ইদু অবিধাসিনী, অসম্ভব এ।—স্বনঘন পত্র দিব বলিয়া এত বিলম্ব

করিয়াছে, তাই এ কথা! ইন্দুর কি ছেলেমানুষি।
 কি সরলতা! “আমায় লইয়া আর কি সুখী হইতে
 পারিবে?”—কি পাগলামি! কিন্তু তবু প্রজ্ঞাতের
 মনের বেধ কাটিল না। কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গলের
 আশঙ্কায় তাঁর প্রাণ “আকুলি বাকুলি” করিতেছিল।
 “ইন্দু! ইন্দু! আমার ইন্দু! ইন্দু কি পাগল
 হইল!”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।



প্রভাত ছুটী লইয়া ইন্দুর কাছে যাওয়াই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন তাঁর শ্বশুরের পত্রে জানিলেম, মন্থধ শ্বশুরবাটী হইয়া শীঘ্র কলিকাতায় পড়িতে আসিতেছে। এই সুযোগে ইন্দুকে আনা সহজে হইবে মনে করিয়া, প্রভাত তখনই শ্বশুরকে পত্র লিখিলেন। উত্তরে শ্বশুরও দিন স্থির করিয়া জানাইলেন। স্থিরকৃত দিনে যথাসময়ে প্রভাত টেলনে উপস্থিত হইলেন। মন্থধও গাড়ী হইতে নামিল। ইন্দু কই? প্রভাত অতিমাত্র আগ্রহে, মন্থধকে শুধাইলেন, “তোমার ঠাকুর-ঝি!” মন্থধ সংক্ষেপে বলিল, “তাঁর আসা হইল না।” “কেন?—” “ঠিক বলিতে পারি না।” “সব ভাল ত’—” “হাঁ।”

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রভাতের উদ্বিগ্ন বাড়িল মাত্র। উদ্ভ্রান্তচিত্তে তিনি বাসায় ফিরিলেন।

বাসায় ফিরিয়া দেখেন, ইন্দুর একখানি চিঠি; ইন্দু গুরু লিখিয়াছে “প্রিয়তম! একবার এস।” প্রভাতের আসন টলিল, সাথেবকে বলিয়া কাহিয়া কোনরূপে পাঁচদিনের ছুটি লইয়া সেইদিনই সন্ধ্যায় ট্রেনে, প্রভাত ইন্দুর উদ্দেশে ছুটিলেন। পরদিন বেলা দশটার পর প্রভাত এসম্মুখের পৌঁছাইলেন। বাহাকে দেখবার জন্য প্রভাত এত ব্যাকুল, সম্মুখে ওই যে সৌর, ওই সৌর প্রভাতের নেই প্রেম-প্রতিমা প্রাতিষ্ঠিত। তবে আজ সেই সূর্যের মন্দির অবশ্য কারতে প্রভাতের মন সহসা এত কাঁদিয়া উঠিতেছে কেন? দূর হইতে চাক কিক্রমে প্রভাতকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে অমানি “প্রভাতবাবু এসেছে গো!” বাগতে বলিতে ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে গেল। ইন্দুর সাহিত চোখোচোখি হইয় চাক একমুখ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে শাসাইল, “দাদা আজ!” বোব হয় চাকর তখন মনে হইতেছিল, “দাদা আসায় এবার বড় আনন্দই জাগাইয়াছে, এখন আমিও তেমন দাদা ভুলবো,” সন্ধ্যায় এই শাসন বাক্য প্রত্যয় করিয়া চাকর

এই বাণিকাসুলভ কল্পনা বুঝিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল, প্রভাতের আগমন সংবাদে ইন্দুর মুখও প্রফুল্ল হইয়াছিল, কিন্তু “দিদি আজ !” এই কথায় কি ভাবনি সহসা কেন সে প্রফুল্ল মুখফলন নিম্নে শুকাইয়া উঠিল ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।



আজ বহুদিনের বিচ্ছেদের পর দম্পতির মিলন হইল। ইন্দুর সেই বিবাদ-মগ্ন মূর্তি দেখিয়া প্রভাত বাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইন্দু, এমন দেখছি কেন?” ইন্দু কিছু বলিল না, স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু বিবাদের হাসি হাসিল। ছিন্ন মেঘের কোলে জীর্ণ সৌদামিনী বেমন হাসে, অনেক দিনের পর ইন্দু আজ তেমনই হাসিল। কিন্তু তখনই আবার জলভরা মেঘের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। প্রভাত আগ্রহভরে ইন্দুকে আলিঙ্গন করিতে বাইতেছিলেন, ইন্দু সরিয়া গেল; বলিল, “আমায় ছুঁয়োনা,” প্রভাত অন্যরূপ বুঝিয়া একটু হাসিয়া ইন্দুকে কোলে টানিয়া লইলেন। তখন ইন্দুর হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা বহিতেছিল। প্রভাত আবার স্নেহ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল ইন্দু, এমন দেখছি কেন? অবন করে, অপরাধীর মত চিঠিপত্রই বা লিখতে কেন? আর

মন্মথের সঙ্গে যেতেই বা আপত্তি কল্পে কেন ?”
প্রভাত দারুণ আগ্রহে, একবারেই তিনটি প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া,
স্বামীর বৃকে মুখ লুকাইয়া, কাঁদিল । পদাশ্রিত
ভক্ত যেমন ইষ্টদেবের সম্মুখে লুটাইয়া লুটাইয়া
কাঁদে, ইন্দু তেমনি করিয়া কাঁদিল ।

তার পর প্রকৃতিস্থ হইয়া, স্বামীর বাহ্যপাশ
হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ইন্দু সরিয়া দাঁড়া-
ইল । দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—“তবে শোন ।”

ইন্দুর সেই উদ্গাহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া প্রভাত মহা-
ভীত হইয়াছিলেন, সমস্ত আলোচনা করিয়া, ইহাও
তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, নিশ্চয় কি এক অঘটন
ঘটিয়াছে । “আর বলতে হবে না—ইন্দু আমি
বুঝেছি,” বলিয়া প্রভাত ভাড়াভাড়ি আবার ইন্দুকে
বৃকে ধরিলেন ।

“না—বুঝ নাই । বুঝিলে এ কানলাপিবারে
এমন আদর করিয়া বৃকে লইতে না ।” বলিয়া
ইন্দু আবার কাঁদিয়া কেলিল ;—“বা বুঝি নাই,
তা আর বুঝে কাজ নাই ইন্দু ! তুমি যে অপ-

বাই কয়ে থাক, আমি তোমার ক্ষমা করলান।
 ইন্দু প্রভাতের নিষেধ শুনিল না। তবু বলিল,—
 “না, শোন!” “না ইন্দু, না, শুনে আর কাজ
 নাই! ‘এস, অন্য কথা কই’ বলিয়া প্রভাত
 ইন্দুর সেই অশ্রুসিক্ত, রোদনাক্রম, অনিন্দ্যাসুন্দর
 মুখখানি ধবিয়া বারবার চুসন করিলেন; তারপর,
 অতি দমে চোখের জল মুছাইয়া, ইন্দুকে আপনার
 পাশে বসাইলেন। অতি সাবধানে অন্য এসজ
 পাড়িলেন, ক্রমে ইন্দুও সে সকল প্রসঙ্গে যোগ
 দিতে আরম্ভ করিল, তাহার সেই মলিন মুখ
 আবার যেন প্রফুল্ল হইল, নির্ঝাঁগোন্মুখ দীপ আবার
 জলিয়া উঠল! প্রভাত বসিলেন, তবে বুঝি বা
 এখনকার মত মেঘ কাটিয়া গেল! এমন সময় কে
 ডাকিল, “ইন্দু, চুল বাধ্বে এস!” “তবে যাই”
 বলিয়া ইন্দু উঠিল, প্রভাতও উঠিয়া বিদায়-চুসন
 দিলেন; এবার ইন্দুও অতিচুসন করিল; সে চুসন
 বড় গুপ্ত, বড় পাত! কিন্তু সহসা কি মনে করিয়া
 সরিয়া দাঁড়াইল, তার পর স্বামীর পানে চাহিয়া-
 চাহিয়া, ইন্দু চলিয়া গেল।

প্রভাত বাহিরে যাইতেছিলেন, সিঁড়ির ঘরে একটু দাঁড়াইয়া শুনিলেন, পাশের ঘরে চেনা গলায় কে বলিতেছে, “ইন্দু, আর লো, তোব মাথা বেঁধে দি” ; ইহার পরেই চরণ প্রভাতের জন্যা ছিল, প্রভাত একটু হাসিয়া বাড়িরে চাঞ্চিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে গেল, তাঁহার অন্তর্নিহিত বীরকান-রীষের প্রতি দৃষ্টি পড়িল—এই যে ভারত, ইহা খাটি না নকল ? ভারিয়া দেখিলে তা না ? নকল হয় হোক, ভারিয়া কি লাভ ? “খাটি ভারত, ইহা খাটি। তবে সে কল ভারিয়া নকল কি ? প্রভাত এই ভাবিয়া আবার আপনাব মন খুঁচ করিলেন।

আর ইন্দু ! ইন্দু, চুল বাঁধিতে গিয়াছে বহু অল্প মনস্থ হইতেছে। সেই ডাক্তার ডাক্তারদিদি, চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে অনেক রাত করিতেছিলেন কিন্তু ইন্দু আজ সে হাসিভাষায়া যেন কিছু পারিতেছে না ! ইন্দু যেন কি এক গম্ভীর চিন্তায় নয় ! চুল বাঁধা শেষ হইলে, ডাক্তার দিদি,—

“সাদা মনে কালো কিতে’র বেঁধে দিলাম চুল,
স্বাধীন পায়ের মনটি রেখে। হয় না যেন ভুল!”

যলিয়া বেশ করিয়া মুখখানি মুছাইয়া দিয়া, একটি
‘টিপ্’ পরাইয়া, ইন্দুর মুখে চুমো খাইলেন। ইন্দু
বিষাদের হাসি হাসিল। ঠাকুরুণছদ্মি বুঝিয়া
গেলেন,—

“মুখের হাসি চাপলে কি হয়—
প্রাণের হাসি চোখে খেলে!”

—

বিংশ পরিচ্ছেদ।



সেই দিন সন্ধ্যার পর চাক তার ঘরে গিয়া দেখে—সর্বনাশ! যেখানাই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওগো! তোমরা শীগ্গির এসো বো” দিদি কেমন কচ্ছে!” চীৎকার শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিলেন, যেখিলেন, ছিন্নকণ্ঠ পক্ষীর মত ইন্দু ভূমিশয়ায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। ইন্দু কখন যে তার ঠাকুরমার কোটা হইতে আঁক চুরি করিয়া ধাইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। “ওমা আমার কি হলো গো!” বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা ইন্দুর মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিল! ইন্দু একবার কাতরদৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া চোখের জল ফেলিল। তার পর চাককে লক্ষ্য করিয়া “কী” কণ্ঠে বলিল, “একবার ডাক্ চাক, একবার ডাক্ !-



দীয়ে ধীরে প্রভাত গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে উঠিয়া খেল। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রভাত বলিলেন, “ইন্দু! ইন্দু! একি?” “বলি” বলিয়া ইন্দু একখানি চিঠি প্রভাতের হাতে দিল, তার পর প্রভাতের পায়ের মাথা মাখিয়া, কাতর কণ্ঠে বলিল, “আমার দাঁত দিনরাত নরকের আগুন জলছে, এ পাশপাশে কোন খাদ্য আর বহিতে পারি নে,— আমি আত্মহনন করা করে ভরনে ঠাই দিলে, কিন্তু আমার জীবন নষ্টিল কই? আর বলতে পারি না, তি... রইলো, আমার দশা যেন সবাই দেখে...”

নতুন... কণ্ঠে, ইন্দু এই করটি কথা বলিল।... কণ্ঠেই ইন্দু আসিতেছিল, বলি বলি... বলিতে পারিল না। ইন্দু তখন... প্রাণপূর্ণলোচনে স্বামীর মুখের পানে... দৃষ্টান্তে ফুল কুসুম যেমন কর্ণ... আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া... ই... ই... ই...

দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া প্রতিমুহূর্তে শুকাইয়া উঠিতেছিল।

ক্রমে মৃত্যুবরণকার ইন্দুর চক্ষু মুদ্রিয়া আসিল। উদ্দামহৃদয়ে আকুলকণ্ঠে প্রলাপত থাকিল, “ইন্দু!” বাণবিকা হরিণী যেমন জীবনের শেষ মুহূর্তেও বংশীরবে শিহরিয়া উঠে, স্বামীর কণ্ঠস্বরে ইন্দু তেমনই শিহরিল। তার পর ধীরে ধীরে সেই বিবেকবিস্কৃত, অতৃপ্ত প্রাণ দেহবিমুক্ত হইল।

সম্পূর্ণ।

